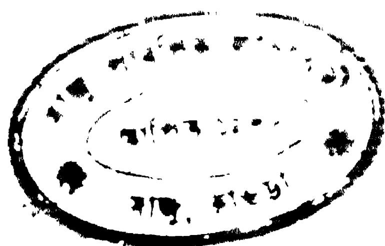
# বঙ্গের কৃতী সন্তান

## প্রথম ভাগ



শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বি. এ., বিদ্যাভূষণ
প্রণীত

এক টাকা ছয় আনা

প্রকাশক—
শ্রীতরুণকুমার পাল
ডায়মণ্ড বুক ষ্টল
ডায়মণ্ড হারবার (২৪ পরগণা)



দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৩৫২ সাল

প্রাপ্তিস্থান :—

বাণী বিথি
২সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কমলা বুক ষ্টল
শিলচর, আসাম

চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী
শ্রীহট্ট, আসাম

প্রিণ্টার—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলিকাতা

# উৎসর্গ

প্রথিতযশা নাট্যকার, কৈশোরের বন্ধু

**শ্রীমন্মথ রায় এম. এ.**

সুহৃদ্বরের করকমলে—

# সূচীপত্র

# বঙ্গের কৃতী সন্তান

## প্রথম ভাগ

## রাজা রামমোহন রায়

কবি গাহিয়াছেন,—

"ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননি,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।"

ভারত আমাদের আজিকার নয়। বিশ্বের বহু জাতি যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, সেই সুদূর অতীতযুগের ভারত পূর্ব্বগগনে নবোদিত সূর্য্যের মত শিক্ষা ও সভ্যতার সমুজ্জ্বল সুবর্ণ আলোকে বিমণ্ডিত ছিল। বর্ত্তমানে যে সমুদয় দেশ শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানে স্ফীত, একদিন এই ভারতবর্ষই ছিল তাহাদের জ্ঞানদাতা গুরু। বহু ভাবেই প্রাচীন ভারতের নিকট তাহারা ঋণী।

কিন্তু কালের স্রোতে এমন একদিন আসিল, যখন ভারত পিছাইয়া পড়িল সকলের পশ্চাতে, লোপ পাইল তাহার প্রতিভার দীপ্তি, জ্ঞানের মহিমা,—সভ্যতার দ্যুতি, শিল্প-বাণিজ্যের ঐশ্বর্য্য,—লুপ্ত হইল তাহার শৌর্য্যবীর্য্য। নানা অবস্থার সংঘাতে ভারত তাহার সমুদয় গৌরব হারাইয়া ডুবিল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে ভগবান্ এক মহাপুরুষকে পাঠাইলেন আলোকবর্ত্তিকাহস্তে দেশবাসীকে নূতন পথের সন্ধান দিতে। এই মহাত্মার নাম রাজা রামমোহন রায়। তিনিই এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনিই ঘুমন্ত দেশকে জাগাইয়া নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে নানাদিকে যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক মনীষী রাজা রামমোহন রায়।

বাংলার, তথা ভারতের এই নব যুগের স্রষ্টা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার এক নিভৃত পল্লী—রাধানগর নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায়, মাতার নাম তারিণী দেবী। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়া তিনি 'রায়' উপাধি লাভ করেন, তদবধি তাঁহার বংশধরেরা ঐ উপাধিই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাব-সরকারে কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া জমিদার-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

অতি শৈশবে রামমোহন মাতামহের গৃহে অবস্থানকালে একদিন পূজার জন্য আহৃত বিল্বপত্র মুখে পূরিয়া দিয়াছিলেন। শিশুর এই আচরণ-দর্শনে মাতামহ ক্রুদ্ধ হইয়া তারিণীদেবীকে কহিলেন, "তোর এই পুত্র বিধর্ম্মী হইবে।" পিতার মুখে এই অভিসম্পাত-বাণী শুনিয়া তারিণীদেবী কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কহিলেন, "বাবা, অবোধ শিশুকে আপনি এ কি অভিশাপ দিলেন ?" ব্রাহ্মণের তখন চৈতন্য হইল, তিনি কন্যাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "মা, আমি যাহা একবার বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না, কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোর পুত্র অসাধারণ পণ্ডিত ও মহাযশস্বী হইবে।" মাতামহের অভিসম্পাত এবং আশীর্ব্বাদ দুই-ই বালকের ভবিষ্যৎ-জীবনে ফলিয়াছিল।

তখন এদেশে সবে মাত্র ইংরেজ-শাসন সুরু হইয়াছে, মুসলমানী আমলের আইন-কানুন কিছুই বদলায় নাই। এখন যেমন ইংরেজী ভাষার আদর, তখন ছিল আরবী ও পারশী ভাষার সেইরূপ আদর। সেকালে আরবী ও পারশী ভাষা না শিখিলে কেহই বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইত না। পাঁচ বৎসর বয়সে বালক রামমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা এবং গৃহে মৌলবীর নিকট তাঁহার পারশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বালক গভীর মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পড়াশুনায় মনোযোগ ও মেধাশক্তি-দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। আট বৎর বয়সেই বালক বাঙ্গালা ও পারশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

এইবার পিতা তাঁহাকে আরবী-শিক্ষার জন্য পাটনায় মৌলবীদিগের নিকট পাঠাইলেন। পাটনায় তিন-চারি বৎসর মৌলবীদিগের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া বালক আরবীতে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার প্রবল আগ্রহ হইল। সংস্কৃত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল তখন কাশী, রামমোহন কাশীতে যাইয়া কাব্য, ব্যাকরণ, উপনিষদ্ বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠে মন দিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু-দিগের বিবিধ শাস্ত্রে অসীম জ্ঞান লাভ করিয়া একজন বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন

পাটনায় মৌলবীদিগের সংস্রবে থাকিয়া পূর্ব্বেই রামমোহন হিন্দুদিগের প্রচলিত পূজাপার্ব্বণ ও আচার-বিচারের প্রতি কিছু কিছু বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইবার কাশীতে বেদান্ত পাঠ করিয়া তাঁহার এই জ্ঞান জন্মিল যে, হিন্দুগণ যে পথে চলিয়াছে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের ঠিক পথ নহে। এই বিশ্বাস লইয়া তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। হিন্দুদিগের প্রতিমাপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত-দিগের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের তর্কে রামমোহনের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'নাস্তিক', 'পাষণ্ড' প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

রামমোহন দেশে ফিরিয়া নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া হিন্দুদিগের প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে তিনি জোর গলায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামে একখানি পুস্তক

প্রকাশ করিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা এই ধর্ম্মবিদ্বেষী বালকের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধেও



বালক ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে পিতা রামকান্ত অতিশয় বিরক্ত হইয়া পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ষোল বৎসরের বালক তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমত সম্বল করিয়া পথে বাহির হইলেন। বহু দেশ-

বিদেশ ও তীর্থ বেড়াইয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য রামমোহন বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, পার হইয়া বহু বিপদ্ আপদের মধ্য দিয়া তিব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিব্বতের বেশীর ভাগ অধিবাসীই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ইহাদের পুরোহিতদিগের নাম 'লামা'। লামারা অত্যন্ত গোঁড়া, নিজেদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথাই তাহারা সহ্য করিতে পারে না। কিছুদিন এই দেশে কাটাইয়া রামমোহন দেখিলেন, এদেশেও ধর্ম্মে ভণ্ডামি ও ভুল-ভ্রান্তির অন্ত নাই। রামমোহন লামাদিগের ভুল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। একজন বিদেশী বিধর্ম্মীর মুখে নিজেদের ধর্ম্মের নিন্দা শুনিয়া লামারা তাঁহার উপর এমনই ক্রুদ্ধ হইল যে, তাহারা তাঁহার জীবননাশের ষড়্‌যন্ত্র করিল। সেবার তিনি এমনই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কয়েকজন দয়াবতী তিব্বতীয় মহিলা কৌশলে তাহার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা না করিলে তাঁহাকে আর প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে হইত না।

কুড়ি বৎসর বয়সে রামমোহন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সকলে মনে করিল, এতদিনে হয়ত তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মাতাপিতা তাঁহাকে আদর করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁহাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। রামমোহন পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুতরাং পিতৃগৃহে তাঁহার আর স্থান হইল না। পিতা পুনরায় তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য তখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশীয় পণ্ডিত ও রাজপুরুষগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

এই সময়ে রামমোহনের পিতার মৃত্যু হওয়ায় রামমোহনকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার মাতাকে কুপরামর্শ দিয়া বিধর্ম্মী পুত্রের নামে আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করাইল। মায়ের বিরুদ্ধে পুত্র মকদ্দমা করিবে, ইহা রামমোহনের নিকট বড়ই বিষদৃশ ঠেকিল। প্রথমে তিনি স্থির করিলেন, সম্পত্তি হাতছাড়া হয় হউক, তথাপি তিনি এই ঘৃণিত মকদ্দমায় অংশ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু শেষে ভাবিলেন, যাহা ন্যায্য, যাহা সঙ্গত, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে, জনসমাজে তাহা হইলে তাঁহার ভীরু অপবাদ রটিবে,—সমস্ত সুনাম নষ্ট হইবে। রামমোহন মকদ্দমা চালাইয়া জয়ী হইলেন। কিন্তু সম্পত্তির এক কণাও গ্রহণ না করিয়া সমস্তই তিনি জননীকে ফিরাইয়া দিলেন। লোকে তাঁহার এই অলৌকিক ত্যাগদর্শনে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। শত্রু-দিগের মুখে চূণ-কালি পড়িল।

অতঃপর তিনি ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটি কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সাধুতা, কর্ম্মদক্ষতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি গুণসমূহ দর্শন করিয়া উচ্চরাজপুরুষগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন। বহু উচ্চপদস্থ দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিল। প্রায় তের বৎসর কার্য্য করার পর তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাড়ী ক্রয়

করিয়া তাহাতে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর।

এই সময় তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মময় জীবনের সূত্রপাত হইল। যেজন্য আজ রামমোহন চিরস্মরণীয়, সেই সমুদয় দেশ ও সমাজ-হিতকর অনুষ্ঠানের প্রকৃত আরম্ভ এই সময়ে। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনের এইবার যথার্থ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি "ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়"—এই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই নূতন প্রচারিত ধর্ম্মের নাম হইল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের তত্ত্ব যাহাতে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে এবং তাঁহার এই ধর্ম্মমত যে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণেরই প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব,—ইহা হিন্দুরই ধর্ম্ম, বিদেশীয় বা বিজাতীয় কিছুই নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্য রামমোহন বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্রসমুহের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কলিকাতা শহরে ভয়ানক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। প্রতিপত্তিশালী গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য এক বিরাট্ তর্ক-সভার আয়োজন করিলেন। বহু দেশবিখ্যাত বড় বড় পণ্ডিত রামমোহনের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এমন যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, অবশেষে গোঁড়ার দল আর পলাইতে পথ পাইলেন না। এই জয়-গৌরব-লাভে রামমোহনের সম্মান, প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি অনেক গণ্যমান্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তাঁহার দলে পাইলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে চিৎপুর রোডের উপর রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে উপাসনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য-পুস্তক ছিল না বলিলেই চলে। পদ্য-গ্রন্থেরই তখন প্রাধান্য ছিল। রামমোহন রায়ই গদ্যে পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালা গদ্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিয়া উহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠ্যোপযোগী বহু বাঙ্গালা পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাঙ্গালা গদ্যে তিনি প্রায় বত্রিশখানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়কেই বর্ত্তমান গদ্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। নবধর্ম্ম-প্রচারের ন্যায় ইহাও রামমোহনের একটি চিরস্মরণীয় সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি।

নবযুগের প্রবর্ত্তক রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, এদেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রচলন না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। সেইজন্য তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। এই ব্যাপারেও তাঁহাকে বহু বিরুদ্ধবাদীর সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, বাঙ্গালীজাতি বর্ত্তমানে যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ইংরেজীশিক্ষা তাহার প্রধানতম কারণ।

সমাজ-সংস্কারেও রামমোহনের দান অপরিসীম। তৎকালে এদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের 'সতীদাহ'-প্রথার প্রচলন ছিল; স্বামীর মৃত্যুর পর বহু হিন্দুরমণী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতেন। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র হিন্দুনারী এইভাবে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতেন। এই

কুসংস্কারজনক নিষ্ঠুর প্রথা দমন করিতে রামমোহন রায় বদ্ধ-পরিকর হইলেন। হিন্দুসমাজের দলপতিগণ সংঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কিন্তু রামমোহন অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া এই জঘন্য প্রথার মুলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইলেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ প্রভৃতি কুপ্রথাসমূহ দমন করিবার জন্যও বহু আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। এই সমুদয় চিন্তা করিলে মনে হয়, তাঁহার ন্যায় হিন্দুসমাজের একজন প্রকৃত দরদী বন্ধু এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

তখন এদেশে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। তাহাদের সহিত কতকগুলি বিষয় লইয়া তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের গোলমাল উপস্থিত হয়। বাদশাহ বিলাতের মন্ত্রিসভায় ব্যাপারগুলি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য রামমোহনকেই উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় বিলাত গমন করেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমুদ্র পার হইয়া বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। বিলাতের শিক্ষিত-সমাজ রামমোহনের বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। ইংলণ্ডের অধীশ্বর চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহাকে বিরাট্ একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রতি অসীম সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গমন করিলে ফ্রান্সের সম্রাট্ তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করেন। বাদশাহ যখন রামমোহনকে তাঁহার পক্ষ-

সমর্থনের জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বিলাতে গমন করিয়া তিনি যে শুধু বাদশাহের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, যাহাতে দেশবাসী ইংরেজশাসনে বহু সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্যও বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে গমন করিয়া যখন ব্রিস্টল শহরে এক বন্ধুর গৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন সহসা তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি হইল না, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল না। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাচ্যের এই গৌরব-সূর্য্য পাশ্চাত্যদেশে চিরদিনের মত অস্তগমন করিলেন। ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সমাধির উপর একটি রমণীয় স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি রামমোহন যে অমৃত-বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে শাখা-পল্লবে শোভিত মহামহীরূহে পরিণত হইয়া দেশবাসীকে সুস্বাদু ফল ও সুশীতল ছায়া প্রদান করিতেছে।



# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাঙ্গালা ১২২৭ সাল, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার। ঐ দিন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক নিষ্ঠাবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে এক বীরশিশু জন্মগ্রহণ করেন। এই শিশুই ভারতবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী।

যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, ঐ দিন ছিল হাটবার, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতাও বৈকালে হাটে গিয়াছিলেন। পথে পিতা রামজয় তর্কভূষণের নিকট তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহাদের বাড়ীতে একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে। ঠাকুরদাস বাড়ী আসিয়াই গোয়ালঘরে যাইয়া বাছুর খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় বাছুর? রামজয় হাসিতে হাসিতে আঁতুড় ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, "ওখানে যাইয়া দেখ।" ঠাকুরদাস তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

এই এঁড়ে বাছুরটি শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। বাড়ীর লোকেরা ত তাঁহার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া উঠিতই, পাড়া-প্রতিবাসীরাও নিস্তার পাইত না। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মস্তিষ্ক ছিল সর্ব্বদা নূতন নূতন দুষ্টামি-আবিষ্কারের একটি বিরাট্ কারখানা। পিতামহ যে পৌত্রটিকে এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন, তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

বালকের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মীয়-স্বজনেরা পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ঈশ্বর-চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হইল। দুরন্ত হইলেও পড়াশুনায় তাঁহার মনোযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। অমন দুরন্ত বালকের পাঠে এইরূপ অভিনিবেশ দর্শন করিয়া আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, এই বালক একদিন একজন দেশবিখ্যাত লোক হইবেন।

তিন বৎসরের মধ্যেই বালক পাঠশালার সমুদয় পড়া শেষ করিয়া ফেলিলেন। পিতার ইচ্ছা হইল, উচ্চশিক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় লইয়া আসিবেন। কিন্তু ছেলেকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার মত অবস্থা তাঁহার নহে। তিনি মাত্র মাসিক দশ টাকা বেতনে কলিকাতায় একটি সামান্য চাকুরী করিতেন, ইহাতে কলিকাতায় ছেলে পড়ান চলে না। যাহা হউক, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

তখন রেলপথ এমনভাবে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয় নাই। গরুর গাড়ী, পাল্কি বা নৌকায় করিয়া কলিকাতায় আসিতে হইত। কিন্তু অর্থের সঙ্গতি না থাকায় ঠাকুরদাসকে পুত্রসহ পদব্রজেই যাত্রা করিতে হইল। নয় বৎসরের বালক কলিকাতায় পড়িবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাসিমুখে পিতার সহিত চলিলেন। পথে আসিতে আসিতে রাস্তার পার্শ্বে পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক 'মাইল-ষ্টোনে' ইংরেজী-সংখ্যা খোদিত দেখিয়া বালক ইংরেজী-সংখ্যাগুলি শিখিয়া ফেলিলেন।

কলিকাতায় ঠাকুর দাস যে মাড়োয়ারীর অধীনে কার্য্য করিতেন, তাহার বাসাতেই তিনি থাকিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রেরও সেই স্থানেই থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১৮২৯খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর মাত্র। প্রথমেই তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। ইহার পূর্ব্বে কখনও তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই, প্রথম দিন হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট ক্লাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক বলিয়া আদর পাইতে লাগিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি পিতার যেমন স্নেহ-ভালবাসা ছিল, শাসনও ছিল তেমনি যথেষ্ট। বালক প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যে পাঠ অভ্যাস করিতেন, বাড়ীতে আসিয়া পিতার নিকট তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। একটি ভুল হইলে আর রক্ষা ছিল না, প্রত্যহ তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইত। রাত্রে পড়িতে পড়িতে পাছে ঘুম পায়, এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র চোখে সরিষার তৈল দিয়া পড়িতে বসিতেন। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজ হইতে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন।

শরীরের তুলনায় তাঁহার মাথাটি ছিল অত্যন্ত বড়। এইজন্য সহপাঠীরা তাঁহাকে "যশুরে কই" বলিয়া ঠাট্টা করিত; কখনও বা কথাটা উল্টাইয়া বলিত, "কশুরে জই"। বালক ইহাতে অত্যন্ত ক্ষেপিয়া যাইতেন। তিনি তোৎলা ছিলেন বলিয়া রাগিয়া গেলে আর কথা বলিতে পারিতেন না, এইজন্য বালকেরা তাঁহাকে আরো বেশী করিয়া ক্ষেপাইত।

ঈশ্বরচন্দ্র যে একদিন 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' হইবেন, তাহার



পরিচয় শৈশব হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। পিতার সামান্য চাকুরী, তাহাতে দুইবেলা পেট ভরিয়া আহার জোটা সম্ভব হইত না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার মাসিক বৃত্তি পাঁচ টাকা হইতে দরিদ্র বালকদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে গৃহে রান্না-বান্না হইতে প্রায় সমুদয় গৃহস্থালীর কার্য্যই নিজহাতে করিতে হইত। ইহাকে দিনের বেলায় পড়ার মোটেই সময় না পাওয়ায় তিনি রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিতেন, কিন্তু রাত্রে প্রদীপ জ্বালাইয়া পড়িবার পয়সা কোথায়? তাই কলিকাতার রাজপথের আলোকের নীচে দাঁড়াইয়া তিনি পাঠ অভ্যাস করিতেন। এইরূপ চেষ্টা, আগ্রহ এবং অধ্যবসায় না থাকিলে কি মানুষ বড় হইতে পারে?

এগার বৎসর বয়সে ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে উঠিলেন। ঐ শ্রেণীতে এত অল্প বয়সের কোনও ছাত্রই ছিল না। অধ্যাপকেরা প্রথমে এত অল্প বয়সের বালককে সাহিত্য-শ্রেণীতে লইতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কারণ এই বয়সে সাহিত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। কিন্তু বালক সাহিত্যের কোনও কোনও স্থান এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপকদিগকে শুনাইলেন যে, তাঁহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ঈশ্বরচন্দ্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি পাঠ করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিলেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র।

ইহার পূর্ব্বেই চৌদ্দবৎসর বয়সে ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল।

সে সময়ে ইংরেজ-সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতা 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' নামে একটি কলেজ ছিল। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-দর্শনে তাঁহাকে ৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ও হিন্দীভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পাঁচ বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করিবার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন কার্য্য করার পরেই উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মতের অমিল হইতে লাগিল। স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর এই অন্যায় প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় তাঁহার এক আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, —"রাগের বশে চাকুরি ছাড়িলে, এখন খাইবে কি ?" বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, আলু-পটল বেচিব, না হয় মুদির দোকান করিব, তবু যে চাকুরিতে সম্মান নাই তাহা করিব না।"

কর্ম্মহীন হইয়া বিদ্যাসাগরকে বেশী দিন বসিয়া থাকিতে হইল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তারা তাহাকে বেশী মাহিনা দিয়া আবার ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অল্প দিন পরেই

সংস্কৃত কলেজ হইতে পুনরায় তাহার সাদর আহ্বান আসিল। বিদ্যাসাগর সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্মদক্ষতাগুণে অবশেষে তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি গভর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট বিদ্যালয়-পরিদর্শকের ( Special Inspector of Schools ) কার্য্যও করিতেন এই সময় তাঁহার মাসিক বেতন হইয়াছিল পাঁচশত টাকা। তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত কলেজের বহুপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু আবার কর্ত্তাদের সহিত মতান্তর ঘটায় বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। তখন হইতেই তিনি স্থির করিলেন যে, আর দাসত্বের বোঝা মাথায় লইবেন না, দেশের শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার, লোকসেবা প্রভৃতি কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিবেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্যভার অর্পিত হয় তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষা-বিশয়ে দেশবাসী বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকায় অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে তাহারা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই অন্ধকার দূর করিতে হইলে দেশে রীতিমত শিক্ষার আলোক বিস্তার করা প্রয়োজন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দেশে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বালকদিগের জন্য একশতটি এবং বালিকাদিগের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তিনি নিজ বাসগ্রামে জননীর নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কলিকাতার “মেট্রোপলিটন”

কলেজও ( বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ ) ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

বিদ্যালয় ত স্থাপিত হইল, কিন্তু পড়ান হইবে কি ? উপযুক্ত পুস্তক কোথায় ? বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে পাঠ্যপুস্তক-রচনার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তস্পর্শে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। বাঙ্গালা ভাষায় যে সুমধুর প্রাঞ্জল গদ্য-সাহিত্য রচিত হইতে পারে, তাহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে এমন বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া লোকসমাজে উপস্থিত করিলেন যে, লোকে বিস্মিত ইহয়া গেল। লোকে আদর করিয়া তাঁহার রচিত "সীতার বনবাস", "শকুন্তলা", "চরিতাবলী", "কথামালা", "বোধোদয়" প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্য পুস্তকসমূহ পাঠ করিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জন্মদাতা। এতদ্ব্যতীত প্রথম শিক্ষার্থী বালকবালিকা-দিগের জন্য তিনি বহু বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন। আজও বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়াই বাঙ্গালী বালকের প্রথমশিক্ষা আরম্ভ হয়।

সুকঠিন সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজ ও সুবোধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় "উপক্রমণিকা" ও "ব্যাকরণ-কৌমুদী" রচনা করেন। প্রথম সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর প্রধান অবলম্বনরূপে আজও তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ ভগবতী ও বিশ্বেশ্বররূপে ভক্তি করিতেন। তাঁহার মাতাপিতৃভক্তির বহু

কাহিনী গল্পের মত প্রচলিত রহিয়াছে। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, তখন জননী ভগবতী দেবী তাঁহাকে কনিষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ-উপলক্ষে বাড়ী যাওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া পত্র লিখিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া ছুটি পাইলেন না। মাতার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার বড়ই দুঃখ হইল। সারারাত মনের দুঃখে অতিবাহিত হইল। প্রভাতেই তিনি একখানি পদত্যাগ-পত্র লিখিয়া লইয়া মার্শেল সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে বলিলেন, "মায়ের আদেশ আমাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। মায়ের মনে দুঃখ দিয়া আমি চাকুরি করিতে ইচ্ছা করি না। যদি আপনি আমাকে ছুটি না দেন, তবে এই লউন আমার পদত্যাগ-পত্র।" সাহেব ঈশ্বর-চন্দ্রের মাতৃভক্তি-দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ছুটি মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগরও পরম আনন্দিত মনে বাড়ী রওনা হইলেন।

বিদ্যাসাগর যেদিন বাড়ী রওনা হইলেন, সেই দিনই রাত্রে বিবাহ। পায়ে হাটিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি দামোদরের তীরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, নদীর অবস্থা ভীষণ, বর্ষার নদীতে ঢল নামিয়াছে, পাহাড়ের মত ঢেউগুলি অবিরাম গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিতেছে। খেয়া নৌকা পরপারে, নৌকার জন্য বিলম্ব করিলে সেদিন আর বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিবেন না। তাঁহার অভাবে বাড়ীতে জননীর প্রাণে কত আঘাত লাগিবে! ইহা চিন্তা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃনাম স্মরণ করিয়া ভীষণ

দামোদরের বুকে ঝাপাইয়া পড়িলেন। পারের লোকেরা তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কাহারও কথায় কান না দিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। ভীষণ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অপর তীরে উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যাইয়া বাড়ী পৌঁছিলেন। পুত্রকে দর্শন করিয়া মায়ের হৃদয়ে আনন্দের আর সীমা রহিল না। মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে কেবল বিদ্যায় সাগরসদৃশ ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার দয়ারও সীমা ছিল না। তাঁহার দানের ও দয়ার কাহিনী আজও সারা বঙ্গদেশে গল্পের মত প্রচলিত রহিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র কখনও নামের জন্য দান করিতেন না, দরিদ্রের দুঃখমোচনই ছিল তাহার দানের উদ্দেশ্য। এই জন্য অনেক সময় তাহার দক্ষিণহস্তের দান বামহস্তও জানিতে পারিত না। শীতের রাত্রে বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইয়াছেন, দেখিতে পাইলেন, কোনও ভিক্ষুক রাস্তায় বসিয়া শীতে কাঁপিতেছে, অমনি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি নিজের গাত্রবস্ত্রখানি সেই ভিক্ষুককে দান করিয়া নগ্নগাত্রে গৃহে ফিরিলেন। কোনও কোনও দিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিবার সময় দুইখানি কাপড়ই কোনও দরিদ্রকে বিলাইয়া দিয়া নিজে গামছা পরিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন।

দরিদ্রের রোগ হইলে অর্থাভাবে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে না, বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে অনেককেই অকালে মরিতে হয়, এই কথা চিন্তা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়

ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তিনি বিনামূল্যে ঔষধ এবং পথ্য দান করিতেন। মেথর, ডোম, সাঁওতাল প্রভৃতিরা এই দেবকল্প মহাপুরুষের দয়ায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে সক্ষাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত। পথিপার্শ্বে নিপতিত ভেদবমি-লিপ্ত কত অসহায় বিসূচিকা-রোগীকে যে তিনি স্বহস্তে বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গিয়া চিকিৎসা দ্বারা জীবনদান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিদ্যালয়ের বহু দরিদ্র ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া উত্তরকালে সমাজে ধনী ও মানী ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য বিলাতে যাইয়া যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি অর্থের অভাবে বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। বহু আত্মীয়-স্বজনের নিকট তিনি সাহায্য চাহিয়াও যখন নিরাশ হইলেন, তখন বিপন্নের বন্ধু ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা তাঁহার মনে পড়িল; তিনি স্বীয় দুরবস্থা জানাইয়া বিদ্যাসাগরকে একখানি পত্র লিখিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে তখন টাকা ছিল না, তিনি ধার করিয়া মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা পাওয়ায় সেবার বিদেশে সপরিবারে মধুসূদনের জীবন ও সম্মান রক্ষা পাইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় লাটসাহেবের সহিত দেখা করিয়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নানাস্থানে অন্নসত্র খুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। নিজ বাড়ীতে বীরসিংহ গ্রামেও নিজ ব্যয়ে একটি অন্নসত্র খুলিয়া ৪।৫ মাস যাবৎ বহু বুভুক্ষা-পীড়িত গরীব-দুঃখীকে অন্ন-বিতরণ করিয়াছিলেন। শীতকালে বহু শীতার্ত্ত দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কম্বল ও শীতবস্ত্রাদি পাইয়া শীত হইতে রক্ষা পাইত।

বালবিধবাদিগের সমগ্র জীবন ব্যাপী অসহনীয় দুঃখদর্শনে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। হিন্দুদিগের নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে, অল্পবয়স্কা হিন্দুবিধবাদিগের বিবাহ-অশাস্ত্রীয় নহে। বিধবা-বিবাহের জন্য প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া অবশেষে তিনি গভর্ণমেণ্ট দ্বারা ইহার জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন। শুধু আইন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, সমাজে যাহাতে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইজন্য তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয়ও হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় যখন দেশে দুই চারিটী বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইল, তখন দেশের বহু লোক তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নানা কুৎসিত ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিতে ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাঁহার বিরুদ্ধে সভাসমিতিও বসিতে লাগিল ; এমন কি, ২।৪ বার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু বীরসিংহের বীর-

শিশু তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া যাহা তিনি সমাজের ও দেশের হিতকর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ব্যপারে সময় সময় তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইত।

পূর্ব্বে কুলীন-সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। এক এক-জন কুলীন ব্রাহ্মণ এত অধিক বিবাহ করিত যে, খাতা না দেখিয়া তাহারা শ্বশুরবাড়ীর নাম বলিতে পারিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কুপ্রথা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্ট দ্বারা কোনও আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যাহাতে এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে কেহ পুনরায় বিবাহ করিতে না পারে, এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

অপরিসীম পাণ্ডিত্য এবং খ্যাতি-লাভ ও প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জন করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে কখনও অহঙ্কার, অভিমান বা বিলাসস্পৃহা স্থান পায় নাই। দৈনিক জীবনযাত্রায় অথবা বেশভূষায় কোনও দিন তাঁহার আড়ম্বর ছিল না। এক জোড়া সাধারণ চটিজুতা এবং গায়ে একখানি মোটা চাদরই ছিল তাঁহার পোষাক। উহা পরিয়াই তিনি লাটসাহেবের সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করিতে যাইতেন। জাতিয়তাবোধ ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রবল। সেকেলে বাঙ্গালীরা একটু ইংরেজী শিখিলেই আচার-ব্যবহারে, আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে এমন কি কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত সাহেবদের অনুকরণ করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মনোভাবকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি এরূপ সাদাসিধা

কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিতেন, যাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিয়া চিনিতে পারিত না। অনেক সময় অনেকে তাঁহাকে বাড়ীর চাকর বলিয়া ভুল করিত। তাঁহার নামের সহিত চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদের এত পার্থক্য ছিল।

একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার কোনও একটা স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। লোকে পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর আসিবেন। দলে দলে বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, সেই দেশবিখ্যাত মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া রাস্তার ধারে সমবেত হইল। বিদ্যাসাগর যথাসময়ে সেই জনসমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। এক বৃদ্ধা বহুক্ষণ যাবৎ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া ছিল,—বিদ্যাসাগরকে দেখিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া গেলে সে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, আপনাদের বিদ্যাসাগর আসিলেন না!" শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "সে কি? আপনি বিদ্যাসাগরকে দেখেন নাই? ঐ যে চাদর-গায়ে বেঁটে-মত কাল লোকটি যাইতেছেন, উনিই ত বিদ্যাসাগর"—এই বলিয়া তিনি আঙ্গুল দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইয়া দিলেন। বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া হতাশকণ্ঠে বলিল, "হা ভগবান্, এই রকম একটা উড়ে বেয়ারাকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ রোদে পুড়িয়া মরিলাম! এর না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ী, না আছে টুপি, আর না আছে সাজ-পোষাক!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও মনে কষ্ট দিতে অত্যন্ত

সঙ্কোচবোধ করিতেন। সামান্য দরিদ্র লোকেরাও আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার জন্য যে উপহার-সামগ্রী লইয়া আসিতেন, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না,—পাছে তাহারা মনে দুঃখ পায় এই ভয়ে। একবার কার্ম্মাটারে অবস্থানের সময় একজন গরীব সাঁওতাল তাঁহাকে একটি মুরগীর ছানা উপহার দিতে আসে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে গলার পৈতা দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, ও জিনিষ তাঁহার ছুঁইতে নাই। সাঁওতাল এই কথায় অত্যন্ত দুঃখিন হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য মুরগীর ছানাটী নিজ হাতে লইলেন। সাঁওতালটির মুখে হাসি ফুটিল।

ঈশ্বরচন্দ্র লোককে অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস করিতেন, এই বিশ্বাসের ফলে তাঁহাকে অনেক সময় ঠকিতে হইত। মানুষের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি শেষবয়সে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন কোনও লোক তাঁহার নিন্দা করিয়াছে শুনিলে তিনি বলিতেন "আমি ত তাহার কোনও উপকার করি নাই, সে আমার নিন্দা করিবে কেন ?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে কেহ বিচলিত করিতে পারিত না। একবার তিনি যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। দারোয়ান তাঁহাকে চটি-জুতা-পায়ে যাদুঘরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া ফিরিয়া আসেন, আর জীবনে কখনও যাদুঘর দেখিতে যান নাই।

যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাদুঘরে যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও মতেই তাহাতে সম্মত হন নাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের উপাধি-বিতরণ-উপলক্ষে সরকার বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "সি-আই-ই" উপাধি দান করেন।

১২২৭ সালে বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী ৺কাশীধামে স্বর্গারোহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কলিকাতায়, তিনি জননীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি মায়ের কথা মনে পড়িলেই বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন।

১২৮২ সালে পিতা ঠাকুরদাস ৺কাশীধামে পরলোকগমন করেন। সে সময়েও ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃহীন বালকের মত ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

১২৯৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী দীনময়ী দেবী স্বর্গারোহণ করিলে তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পান। পত্নী-বিয়োগের এই আঘাত বৃদ্ধবয়সে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার উপর আবার হিক্কা-রোগের আক্রমণে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই, বাংলা ১২৯৬ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় বঙ্গজননীর এই সুপুত্র দেশবাসীকে কাঁদাইয়া মহাপ্রস্থান করেন। বাঙ্গালার এই

ক্ষণজন্মা কৃতী সন্তানের স্মৃতি আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় বিরাজিত থাকিয়া তাহাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্বের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

"বীরসিংহের সিংহ-শিশু! বিদ্যাসাগর! বীর,
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্য্যে সুগম্ভীর।
সাগরে যে অগ্নি আছে, কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্রদেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্যমূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার।
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
ক'র্‌লে পূরণ অনাথ-আতুর-অকিঞ্চনের সাধ,
অভাজনে অন্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি ক'র্‌লে কতবার।"

—৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

# দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মানুষ সংসারে আসে, সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া আবার চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন এই ধূলির ধরণীতে অবিনশ্বর কীর্ত্তির মন্দির গড়িয়া যাইতে পারে?—কয়জনের নাম তাহাদের মৃত্যুর পরেও দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে? জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কয়জনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকে?

আজ যাঁহার পুণ্যময় জীবনকথা তোমাদিগকে বলিব, সত্যই এই স্বার্থময় পৃথিবীতে তাঁহার মত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কর্ম্মী খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার মহত্ত্ব, দেশবাসীর দুঃখে আকুলতা, জনসেবা, সর্ব্বোপরি এক পরাধীন জাতির মুক্তি কামনায় তাঁহার সর্ব্বস্বপণ সত্য-সত্যই একটা জাতির গর্ব্বের বিষয়। বাস্তবিক চিত্তরঞ্জন দেশকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার দেশভক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা নাম কিনিবার জন্য নহে। দেশের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল বলিয়াই ধনীর দুলাল ভোগৈশ্বর্য্যের সুকোমল ক্রোড়ে আ-যৌবন বর্দ্ধিত চিত্তরঞ্জন দেশের মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া কারাবরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ত্তমানে অধিকাংশ নেতারই দেশসেবা যেমন ভণ্ডামিতে পূর্ণ, চিত্তরঞ্জনের দেশভক্তিতে সে ভণ্ডামির লেশমাত্র ছিল না। দেশমাতৃকাকে অমন করিয়া মনে-প্রাণে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই,—দেশবাসীর দুঃখে দরবিগলিত ধারায়

অশ্রুপাত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই দেশবাসীর নিকট তিনি **দেশবন্ধু** নাম লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌরবময় উপাধি কি শতশত রাজভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য উজাড় করিয়া লাভ করা যায় ?

একদিন যিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার মিষ্টার সি, আর, দাশ, দেশের জন্য আত্মোৎস্বর্গ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তিনি হইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই ত্যাগ মহর্ষি দধীচির আত্মত্যাগ বা সিদ্ধার্থের ত্যাগের তুলনায় সামান্য নহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকাভিভূতহৃদয়ে অশ্রুপাত করিয়া গাহিলেন,—

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।'

—এই অল্পকথার মধ্যে কবির প্রাণের কি সুগভীর শোকচ্ছ্বাস এবং কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, তাহা তোমরা বড় হইয়া বুঝিতে পারিবে।

দেশের মুক্তিসংগ্রামে দেশবাসী তাঁহাকেই সেনাপতির আসনে বসাইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানে আজ যে আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, বাংলার দুর্ভাগ্য যে, আজও তাহা পূর্ণ করিবার যোগ্য লোক জুটিল না।

বীরত্ব, শিক্ষা, সভ্যতা ও পাণ্ডিত্যের লীলাভূমিরূপে বিক্রমপুর বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এবং শীর্ষ স্থানীয়। এই বিক্রমপুর দেশবন্ধুর পৈত্রিক বাসভূমি। বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলীরবাগ নামক গ্রামে সুবিখ্যাত বৈদ্যবংশে দেশবন্ধুর পিতা ভুবনমোহন

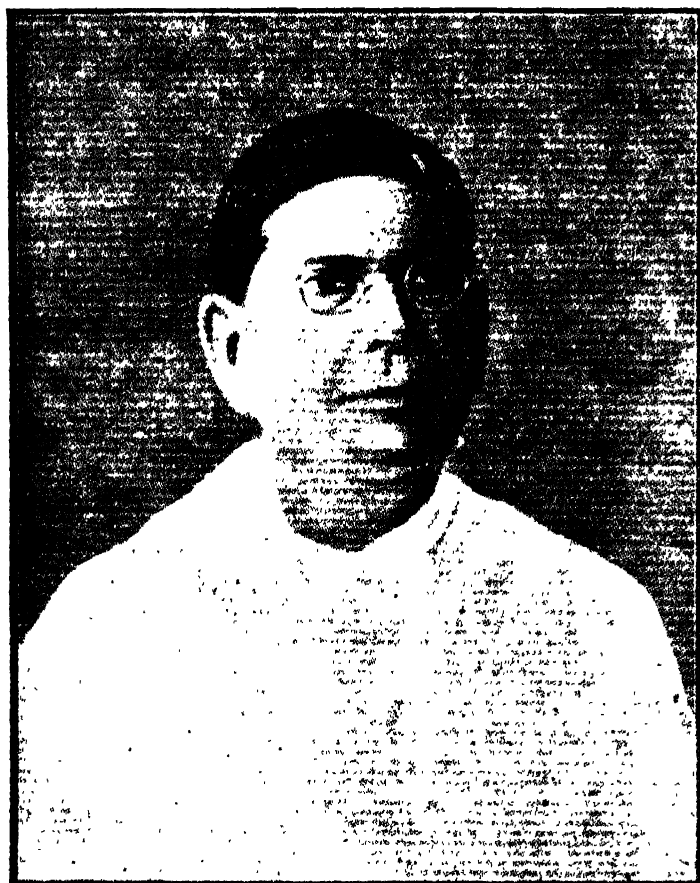
দাশ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরকালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত এটর্ণি হইয়াছিলেন।

বাংলা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক, ইংরেজী ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন।

ভুবনমোহন এটর্ণী ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং পুত্র চিত্তরঞ্জন শৈশব হইতেই ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের সুকোমল অঙ্কেই লালিত হইয়াছিলেন। ভুবনমোহন যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার দানও ছিল তেমনি প্রচুর দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত; তিনি দরিদ্র-দিগকে অকাতরে দান করিতেন। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশভক্ত। চিত্তরঞ্জন পিতার এই দয়াধর্ম্ম ও দেশপ্রেম উভয় গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। বিদ্যালয়ে চিত্তরঞ্জন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার চোখে-মুখে প্রতিভার এমন একটা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইত যে, তাহা দেখিয়া মনে হইত, এই বালক একদিন একজন কৃতী মহাপুরুষ হইবেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে পড়িবার সময়ও চিত্তরঞ্জনের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি যত না আকর্ষণ ছিল, তাহার বেশী আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল বাহিরের পুস্তক পড়ায়। কবিতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল।

কলেজে পড়ার সময় প্রফেসার যখন পড়াইতেন, চিত্তরঞ্জন সেদিকে মনোযোগ না দিয়া হয়ত কবিতা রচনা করিতেন, নতুবা অন্য বই পড়িতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক ছিল তাঁহার বড় আদরের



জিনিষ। কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার কবিত্ব, সাহিত্যপ্রিয়তা এবং বাক্‌পটুতা-দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। সারা বৎসর পাঠ্যপুস্তকের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া পরীক্ষার দুই একমাস পূর্ব্বে তিনি পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ

করিতেন এবং দিবারাত্র পড়িয়া পরীক্ষা দিতেন, এইরূপে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বিশেষ দক্ষতার সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কলেজে পড়ার সময় হইতেই চিত্তরঞ্জন তর্ক করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তর্কের কোনও একটা সুযোগ পাইলেই তিনি তাহা লইয়া মাতিয়া উঠিতেন। সে তর্কের মধ্যে থাকিত সুন্দর সামঞ্জস্য, যৌক্তিকতা এবং অপূর্ব্ব বাক্যবিন্যাস। তর্কে প্রায়ই কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিত না। উত্তরকালে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইবেন, পাঠ্যজীবনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাতযাত্রা করেন। এই সময়ে ভারত-বিখ্যাত নেতা দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন নৌরজীর পক্ষ সমর্থন করিয়া নানাস্থানে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি-দর্শনে বিলাতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিলাতের অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার বক্তৃতা ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই বক্তৃতা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইলেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কয়েকদিন উপস্থিত হইয়া চিত্তরঞ্জনের মনে হইল, তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। কাজেই অবশিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষায় আর তিনি উপস্থিত হইলেন না। এই কারণে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করা আর

তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল, পঞ্চাশ জন উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর নামের তালিকার ঠিক নীচেই চিত্তরঞ্জনের নাম রহিয়াছে! সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিলে ফল যে কি হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চিত্তরঞ্জনের এই অকৃতকার্য্যতা ভারতবর্ষের পক্ষে অশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল।

বিদেশে বিজাতীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শের মধ্যে বাস করিয়া চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রীতি বিন্দুমাত্র মন্দীভূত না হইয়া বরং আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি ও দেশবাসীর মুখে ভারতের বা ভারতবাসীর কোনও প্রকার নিন্দা শুনিলে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন এবং তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। জেম্‌স্‌ ম্যাক্‌লিন নামে পার্লামেণ্টের একজন সভ্য ভারতবর্ষকে অসভ্যের দেশ এবং ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানকে গোলামের জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের ইহা সহ্য হইল না, তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মত বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া প্রতিবাদ জানাইলেন। তাঁহার এই প্রতিবাদে বিলাতে এমন আন্দোলনের সৃষ্টি হইল যে, ম্যাক্‌লিন অবশেষে চিত্তরঞ্জনের কাছে আসিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইলেন। বিলাতে অবস্থানকালে চিত্তরঞ্জন আরও বহুবার এইরূপ দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হইয়া চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন

করেন। চিত্তরঞ্জন কলিকাতা-হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ওদিকে পিতা ভুবনমোহন অপরিমিত দান ও অমিতব্যয়িতার জন্য ভয়ানক-ভাবে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহাকে দেউলিয়া নাম লিখাইতে হইল। চিত্তরঞ্জনও পিতার সমুদয় ঋণভার স্কন্ধে লইয়া পিতার সহিত দেউলিয়ার খাতায় নাম-স্বাক্ষর করেন। তাঁহার অন্তরে অন্তরে এই ধারণা ছিল যে, একদিন তিনি পিতার ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করিবেন। তিনি অধ্যবসায়ের সহিত ব্যারিষ্টারীতে লাগিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজী ১৯০৮ সালে আলিপুরের বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জন বঙ্গমাতার সুসন্তান দেশপূজ্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করেন। প্রায় আটমাসকাল এই মকদ্দমা চলিয়াছিল, এই মকদ্দমা-পরিচালনায় তিনি যে গভীর আইনজ্ঞান, বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে দেশময় ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। সাধারণে জনিতে পারিল যে, চিত্তরঞ্জন কলিকাতা-হাইকোর্টের একজন সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ক্রমে ক্রমে তাঁহার হাতে বড় বড় মকদ্দমা-পরিচালনের ভার পড়িতে লাগিল। তাঁহার অর্থাগমের পথও শত-মুখে খুলিয়া গেল। এইরূপ শুনা যায় যে, তাঁহার সমসাময়িক ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে সে সময়ে পৃথিবীতে যাঁহারা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কমলার কৃপালাভ করিয়া চিত্তরঞ্জন পিতার সমুদয় ঋণ

পরিশোধ করিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি উত্তমর্ণদিগকে ফাঁকি দিতেও পারিতেন, কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার এই মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া দেশবাসী বিস্মিত হইল।

চিত্তরঞ্জনের দানের তুলনা নাই। দান করিয়া নাম কিনিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। দেশের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে গড়িয়া উঠিয়াছে। শত শত অনাথ, গরীব-দুঃখী তাঁহার গোপন-দানে কৃতার্থ হইয়াছে। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার দানে লেখাপড়া শিখিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তাহার পর তাঁহার শেষ দান,—যে-দান বিশ্বের বুকে তাঁহার জন্য অমর স্বর্ণ-কীর্ত্তিসৌধ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ও কলিকাতার বাসভবনটি পর্য্যন্ত জাতির সেবায় দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ বাসভবনটি **চিত্তরঞ্জন সেবাসদন**-নামে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া তাঁহার অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধি গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহ-যোগিতা ঘোষণা করেন। চিত্তরঞ্জন প্রথমতঃ মহাত্মার এই নীতি সমর্থন করেন নাই, কিন্তু তিনমাস পরেই নাগপুর কংগ্রেসে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তিনি অসহযোগ-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অসহযোগব্রত অবলম্বন করিয়া চিত্তরঞ্জন দেশসেবার জন্য

বিশাল আয়ের ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিলেন। সামান্য খদ্দরের ধুতি-চাদর পরিয়া সন্ন্যাসীর বেশে সস্ত্রীক বাংলার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া অসহযোগমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে ব্যারিষ্টার মিঃ সি. আর. দাশ হইলেন **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**। তাঁহার অগ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল, তাহা প্রতিরোধ করিতে গভর্ণমেণ্ট অবশেষে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় মাসের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন। ছয়মাস পরে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশবন্ধু পুনরায় দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু কলিকাতা-কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র-পদে নির্ব্বাচিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতা নগরীর বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় সপরিবারে দার্জ্জিলিঙে গমন করেন। তথায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন মঙ্গলবার বঙ্গমাতার এই কৃতী সন্তান বঙ্গবাসীকে অশ্রুসাগরে ভাসাইয়া ৫৫ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করেন।

তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনাইয়া কেওড়াতলা শ্মশানে সৎকার করা হয়। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে তাঁহার শবানুগমনে যেরূপ সর্ব্বজাতীয় বিরাট্ জনসমাগম হইয়াছিল, শবানুগমনে সেরূপ জনতা পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই বোধ হয় প্রথম।

চিত্তরঞ্জন কেবল স্বদেশপ্রেমিক ও দানশীলই ছিলেন না, তিনি সুসাহিত্যিক, কবি ও পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সাগর-সঙ্গীত'-নামক কব্যগ্রন্থখানি বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একখানি মহামূল্য রত্নরূপে রক্ষিত থাকিবে।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর যাহা কিছু, তাহা ছিল তাঁহার বড় আদরের। তিনি বলিয়াছিলেন,—"**আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি। বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে বাংলাকে জানে না।**"

দেশবন্ধুর লিখিত একটি কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল—

### বাঙ্গালীর সঙ্গীত

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীত, পূর্ণ কর আশ,
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি হিংসাদ্বেষ বিদ্রূপ-বিলাস,
এই মহামন্ত্র রাখি' বক্ষেতে বাঁধিয়া—
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
ওই হের দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগনভালে রবিরশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

ওই শোন দৈববাণী গগনে গর্জ্জিয়া
আলোড়িছে বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রাণমন;
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।
শুনো না অলীক কথা মিথ্যা প্রলোভন,
সঁপিও না সর্ব্ব আশা বিদেশি-চরণে,—
দূর কর দুর্দ্দিনের মিথ্যা আলাপন,
সত্যেরে সহায় কর জীবনে-মরণে।
দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া,
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন।
আপন কর্ম্মেরে দৃঢ়হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

# আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেতারের রাজ্য। সংবাদ, গান, বক্তৃতা, এমন কি ছবি পর্য্যন্ত আজকাল বেতারে প্রেরিত হইতেছে। এই বেতার-আবিষ্কার দ্বারা জগতের যে একটা মহা উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইটালীদেশীয় মার্কনি বিশ্ববাসীর নিকট এই বেতার-তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া বিদিত। কিন্তু ইহার প্রথম গৌরব প্রাপ্য আমাদেরই দেশবাসী জগদীশচন্দ্রের ; বেতার-তত্ত্বের উদ্ভাবন-কল্পনা সর্ব্বপ্রথম জাগিয়াছিল এই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকেরই মস্তিষ্কে। শুধু জাগিয়াছিল বলিলেই চলিবে না, তিনি উপযুক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া এই তত্ত্বের সত্যতা সর্ব্ব-প্রথম প্রমাণ করিয়াছিলেন বাঙ্গালার ছোটলাট-সাহেবের সম্মুখে। কিন্তু মার্কনির বরাত ভাল, তাই বিশ্ববাসীর নিকট তিনিই ঘোষিত হইলেন বেতার-তত্ত্বের আবিষ্কারকরূপে। জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আপার সার্কুলার রোডে তাঁহার বাড়ীতে বেতার-যন্ত্রযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়া জনসাধারণকে দেখাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, এই সময়ে বিলাত হইতে বিজ্ঞান-সভায় তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল, তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তথায় যাত্রা করিলেন। এত বড় একটা আবিষ্কারের উদ্বোধন অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল।

সেই বৎসরেই মার্কনি জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণে বেতারবার্ত্তা-প্রেরণের কৌশল আবিষ্কার করিয়া তাহা আইনমত রেজেষ্টারী করিয়া লইলেন। সুতরাং আইনতঃ মার্কনিই হইলেন বেতার-তত্ত্বের আবিষ্কারক। আর যিনি যথার্থ আবিষ্কারক, তিনি পড়িলেন ফাঁকিতে।

বেতার-আবিষ্কারই জগদীশচন্দ্রের একমাত্র কৃতিত্ব নহে, তিনি আরও এমন সব বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করিতেও পারেন নাই। জগদীশচন্দ্রের সেই সমুদয় আবিষ্কারে বিজ্ঞান-জগতে একটা নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা বিশ্ববাসীর বহু উপকার সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে নব্য বিজ্ঞানের জন্মস্থান পশ্চিমদেশের অধিবাসিগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারতবাসী কেবল দার্শনিক-তত্ত্ব-উদ্ভাবনেই শ্রেষ্ঠ নহেন, বৈজ্ঞানিক-সত্য-আবিষ্কারেও তাঁহাদের মস্তিষ্ক অসাধারণ শক্তিশালী। দার্শনিক-প্রতিভায় যেমন বিবেকানন্দ, কাব্যপ্রতিভায় যেমন রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক-প্রতিভায়ও তেমনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিশ্বকে বিস্মিত করিয়া বঙ্গজননীর শিরে চির উজ্জ্বল হীরক-মুকুট পরাইয়া গিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের গৌরবে আজ ভারতবাসী গৌরবান্বিত। নিউটন, ফেরাডে, কেল্‌ভিন, কুরি, ডারউইন, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিকগণের নামের সহিত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের নামও সমানভাবে গ্রথিত থাকিবে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মতিথি-উৎসবে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে-ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্মমাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে,
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে।"

জগদীশচন্দ্রের জন্মস্থান ঢাকা জেলাস্থ বিক্রমপুর পরগণার রাড়িখাল গ্রামে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভগবান্‌চন্দ্র বসু। তিনি অনেকদিন ফরিদপুরে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের শৈশব সেইখানেই অতিবাহিত হয়।

ভগবান্‌চন্দ্র ইংরেজী-শিক্ষিত এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়াও পুত্রকে তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি না করিয়া দিয়া প্রাথমিক বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই বিদ্যালয়ে শুধু গরীবের ছেলেরাই পড়িত, তাহাদের মধ্যে আবার সূত্রধর, ধীবর, কৃষক, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতির সন্তানই অধিক। ভগবান্‌চন্দ্র স্বীয় আভিজাত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুত্রকে সেইখানেই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এই সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র নিজে কি লিখিয়াছেন ?—"শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী-স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া

গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণদিকে আমার পিতার মুসলমান-চাপ-রাশীর পুত্র এবং বামদিকে এক ধীবর-পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য্য-অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।”

বালক জগদীশচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহার উপর ছিল, সে ছিল একজন জেলফেরত দাগী ডাকাত। ভগবান্‌চন্দ্রের বিচারেই তাহার জেল হইয়াছিল। দণ্ডভোগের পর সে আসিয়া ভগবান্‌চন্দ্রের হাতে-পায়ে ধরিয়া পড়িল, তাহাকে একটা চাকুরী দিতে হইবে, নতুবা সে অনাহারে মারা যাইবে।

কিন্তু দাগী ডাকাতকে চাকুরী দিবে কে? অথচ চাকুরী না পাইলে হয়ত সে আবার পেটের দায়ে চুরি-ডাকাতি করিতে বাধ্য হইবে। তাই দয়াপরবশ হইয়া ভগবান্‌চন্দ্র তাহাকে পুত্রের ভৃত্যপদে নিযুক্ত করিলেন।

সৎসঙ্গে পড়িয়া দস্যুর চরিত্র বদ্‌লাইয়া গেল। চুরি-ডাকাতির প্রবৃত্তি আর তাহার রহিল না। সে বালক জগদীশচন্দ্রকে কোলে-পিঠে করিয়া রোজ স্কুলে লইয়া যাইত, আবার লইয়া আসিত।

বাড়ীতে জগদীশচন্দ্র তাহার কাছে বসিয়া কত ডাকাতি, মারামারি ও রক্তারক্তির গল্প বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে অবাক্ হইয়া শুনিত।

ফরিদপুরে বাংলা-শিক্ষা শেষ হওয়ার পর পিতা পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। জগদীশচন্দ্র হেয়ারস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে শহুরে সভ্যতাভিমানী সহপাঠীদের

নিকট বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইত। একে জগদীশচন্দ্র বাঙাল, তাহার উপর আবার সদ্য সদ্য পাড়াগাঁ হইতে আগত। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও চাল-চলনে অস্বাভাবিকত্ব দেখিয়া সহপাঠিগণ তাঁহাকে নানাভাবে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ বালক জগদীশচন্দ্র বুঝিলেন, ইহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে না পারিলে নিস্তার নাই। সুতরাং সহপাঠীরা তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেই তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উপর কিল, চড়, ঘুষি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহপাঠীরা বুঝিল, এই বাঙাল ছোক্‌রাটি তাহাদের মত দুর্ব্বল ও নিজ্জীব নহে। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা শায়েস্তা হইয়া গেল, মুখের উপর আর কোনও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে সাহস করিত না। তদুপরি জগদীশচন্দ্র যখন পড়াশুনায় তাহাদের অনেককেই পশ্চাতে ফেলিলেন, তখন বাহিরে না হউক, মনে মনে তাহাদের শির শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিতে লাগিল।

সেখান হইতে জগদীশচন্দ্রকে ইংরেজীতে বিশেষ পারদর্শিতা-লাভের জন্য সেণ্ট্ জেভিয়াস´ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেখানকার অধিকাংশ ছাত্রই ইউরোপীয়, সুতরাং প্রথম প্রথম জগদীশচন্দ্রকে খুবই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়-প্রভাবে তিনি অচিরেই সেই অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ হইলেন।

১৮৭৭ সালে জগদীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্ট্ জেভিয়াস´ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সেখান হইতেই চারি বৎসর পরে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর ডাক্তারী পড়িবার জন্য পিতা তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইলেন। ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি এক বৎসর পরে উহা ছাড়িয়া দিয়া কেম্ব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইলেন। তিন বৎসর পরে তিনি সেখান হইতে বিজ্ঞানে 'ট্রাইপোস' পাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।



জগদীশচন্দ্র ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের সুপারিশে অস্থায়িভাবে ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন সার্ভিসে

( আই-ই-এস্ ) প্রবেশলাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে কাজ করিতে লাগিলেন।

সেকালে আই-ই-এস্ ইংরেজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীদের বেতনের বিশেষ তারতম্য ছিল। দেশীয় কর্ম্মচারীরা পাইতেন ইংরেজ-কর্ম্মচারীদের দুই-তৃতীয়াংশ টাকা। তাহার পর বেতন লইবার সময় জগদীশচন্দ্র দেখিলেন, তিনি অস্থায়িভাবে কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য-বেতনের অর্দ্ধেক কাটিয়া লওয়া হইতেছে। ইহাতে জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি ঐ বেতন গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ বিনাবেতনেই কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দুই-একমাস নয়, সম্পূর্ণ তিনটি বৎসর তিনি এইভাবে কাজ করিলেন। জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার তিন বৎসরের প্রাপ্য সমুদয় টাকা একসঙ্গে প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল বিদ্যুৎ ও ঈথর-তরঙ্গ। ইহা লইয়া গবেষণা করিতে করিতেই তিনি বেতারে সংবাদ-প্রেরণের সূত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হন। তখনও বিশ্ববাসীর নিকট এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই অজ্ঞাত তত্ত্বের আবিষ্কার করেন আমাদেরই তরুণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি, সুতরাং এস্থলে আর পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

ইতোমধ্যে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় মৌলিক বিষয়ে ইউরোপীয় বিভিন্ন পত্রিকায় যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক-সমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৯৬ সালে বিলাত হইতে নিমন্ত্রণ আসিল-তাঁহাকে সেখানে অদৃশ্য-আলোক-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। ঐ বৎসরই তিনি পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। ইহাতেই বেতারতত্ত্ব-গবেষণায় বাধা পড়িল।

বিলাতের শিক্ষিতসমাজ তাঁহার বক্তৃতায় অদৃশ্য-আলোকরশ্মি-সম্বন্ধে বহু নূতন নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শতকণ্ঠে প্রশংসাবাদ জ্ঞাপন করিলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন প্রভৃতি বহু মনীষী ব্যক্তি জগদীশচন্দ্রকে বিলাতেই অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না।

শুধু বিলাতে নহে, প্যারিসে এবং বার্লিনেও বহু বৈজ্ঞানিক-সভায় বক্তৃতা দিয়া তিনি অশেষ সম্মান অর্জ্জন করিলেন। তাঁহার এই গৌরব-অর্জ্জনে গর্ব্ববোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

"বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম-মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়াছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হ'তে আনি'
দীনহীনা জননীর লজ্জানতশিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়

বহু সাধুবাদধ্বনি নানাকণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গভীরমন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধু পার।
আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদখানি
জগত-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে!

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব অধ্যাপনাকার্য্যে যোগদান করিলেন। এইবার তিনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া 'জড় ও অচেতনের সাড়া' বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলেন। গবেষণা করিতে করিতে জড় ও অচেতন-সম্বন্ধে বহু অপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত তত্ত্ব তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল।

১৯০০সালে প্যারিসে পদার্থবিদ্যা-সম্বন্ধে যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে বক্তৃতা-দানের জন্য জগদীশ-চন্দ্রের সাদর-নিমন্ত্রণ আসিল। জুলাই মাসে তিনি সস্ত্রীক প্যারিসে যাত্রা করিলেন। মানুষের জীবন এবং গাছপালার জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত হয়, তাহাই ছিল জগদীশ-চন্দ্রের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়। প্যারিসের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট তিনি তাঁহার এই অভিনব আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়া বিলাতে বক্তৃতা-দানের জন্য যাত্রা করেন।

বিলাতের কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া যাহাতে এই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক উপহাসাস্পদ হন, যাহাতে তাঁহার প্রবন্ধ বা বক্তৃতা লোকসমাজে প্রকাশিত হইতে না পারে, সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা ও অকাট্য প্রমাণ সমস্ত বিরুদ্ধাচারীকে পরাজিত ও নির্ব্বাক্ করিয়া দিয়াছিল।

পশ্চিমের জয়মাল্যে ভূষিত হইয়া জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবার-উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'সি-আই-ই' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন।

১৯০৭ সালে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা-প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির সত্যতা তিনি যন্ত্রসহকারে প্রমাণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন।

পরবৎসর ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চতুর্থবার বিদেশে প্রেরণ করেন। জগদীশচন্দ্র লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, চিকাগো, ক্যালিফোর্ণিয়া ফিলাডেলফিয়া, টোকিও প্রভৃতি স্থানের বিজ্ঞান-পরিষদে তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহ প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক স্থলেই তাঁহাকে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর তর্কযুদ্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহাদের প্রত্যেককেই জগদীশচন্দ্রের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

স্বদেশে ফিরিয়া আসার পরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি-এস্-সি' উপাধি প্রদান করেন। ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ্জের

করোনেশন-উপলক্ষে তাঁহাকে 'সি-এস্-আই' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে তিনি পরম গৌরবময় 'নাইট্' ( স্যার ) উপাধি লাভ করেন।

জগদীশচন্দ্র যখন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রথমবার বিলাতে গমন করেন, তখন তথাকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান 'রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট' দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভারতবর্ষেও ঐ প্রকার একটি বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প জাগিয়াছিল। তদবধি তিনি তাঁহার দৈনিক ব্যয়বাহুল্য কমাইয়া স্বীয় অভীষ্ট-সাধনের জন্য অর্থ-সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৭ সালে জগদীশচন্দ্রের সেই জীবনব্যাপী স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। ঐ বৎসর ( ১৩২৪ সন, ১৪ই অগ্রহায়ণ ) জগদীশচন্দ্র "ভারতের গৌরব ও কল্যাণ-কামনায়" "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির"-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আজ তথায় তাঁহার বহু ভক্ত শিষ্য নব নব বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছেন।

মন্দির-উদ্বোধন-দিবসে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন,—

"মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে,
বর-পুত্র-সঙ্ঘ বিরাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ, বাজ হে।"

ইত্যাদি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তাঁহার নবাবিষ্কৃত 'ক্রেস্কো-গ্রাফার' এবং অপর কয়েকটি যন্ত্রের পরীক্ষা-প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক পঞ্চমবার বিলাতে প্রেরিত হন। বাহিরের

উত্তেজনায় গাছ কিরূপে সাড়া দেয় এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে গাছের বৃদ্ধি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্য 'ক্রেস্কোগ্রাফার'-যন্ত্রটির সৃষ্টি। গাছের সাড়া ও বৃদ্ধি এই যন্ত্রে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ-ভাবে ধরা দেয়। এই বৎসর মে মাসে জগদীশচন্দ্র রয়েল সোসাইটির মহাগৌরবময় সভ্যপদ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মাত্র একজন ভারতবাসী এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তিনি মান্দ্রাজী, নাম রামানুজম্।

১৯২৮ সালে জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়া জেনেভা যাত্রা করেন, ইহাই তাঁহার শেষ ইউরোপ-যাত্রা।

এই বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্রের জীবনের সপ্ততি-তম বৎসর পূর্ণ হয়। বন্ধু রবীন্দ্রনাথ প্রধান উদ্যোগী হইয়া দেশবাসীর সহায়তায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের এই জন্মতিথি-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর জগদীশচন্দ্রের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ১৯৩৭ সালের ২রা নভেম্বর তিনি গিরিডিতে গমন করেন। ২৯শে নভেম্বর প্রাতে ৮টার সময় সহসা তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বের বিজ্ঞান-গগনের একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভিয়া গেল।

জগদীশচন্দ্র গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি,—তাঁহার আবিষ্কারসমূহ বিশ্বের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ নিত্য নব নব আলোকে উদ্ভাসিত করিতে থাকিবে।

---

# সৈয়দ আমির আলি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গমাতার যে সমুদয় মুসলমান-সন্তান স্বকীয় প্রতিভা ও কীর্ত্তিপ্রভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সৈয়দ আমির আলি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সে যুগে বাংলার মুসলমান-সমাজ এত দূর উন্নতি লাভ করে নাই, শিক্ষা এবং উচ্চ রাজকার্য্যে তখন বঙ্গীয় মুসলমানগণ বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন ; মুসলমান-সমাজের সেই স্বল্পালোকিত যুগে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন সৈয়দ আমির আলি একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে। শিক্ষায়, চরিত্রে, মনস্বিতায়, সমাজ-সেবায় তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল আলোক চিরদিন বাংলার মুসলমান-সমাজকে আলোকিত করিয়া রাখিবে।

১৮৪৯ সালে হুগলী জেলার চুঁচুড়া সহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান-বংশে সৈয়দ আমির আলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ সাদত আলি। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। বালক আমির আলির শৈশবোচিত কার্য্য-কলাপের মধ্যে ভবিষ্যৎ-প্রতিভার এমন সব আভাষ পাওয়া যাইত যে, তদ্দর্শনে মনে হইত, বালক একদিন স্বজাতি ও স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

তখনও দেশে ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, বিশেষতঃ তৎকালীন মুসলমান-সমাজ অন্ধ গোঁড়ামির এত দূর ভক্ত ছিলেন

যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাঁহারা একান্তভাবেই দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন। সে যুগেও সৈয়দ সাদত আলি গোঁড়ামির মোহপাশ ছিন্ন করিয়া পুত্রকে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-প্রিয়তায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধচারিতায় সাদত আলির ব্যবসায়ে প্রভূত ক্ষতি হইতে লাগিল। তথাপি তিনি স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

সাদত আলি পুত্রকে হুগলী জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমীর আলি স্বীয় প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তাবলে বিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরিক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন।

বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া আমির আলি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি বিশেষ যোগ্যতাসহকারে এফ্. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। যে বৎসর তিনি বি. এ. পাশ করেন, তাহার পর বৎসরই এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী-মুসলমান এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। অবশেষে আমির আলি বি. এল্. পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন।

ওকালতি পাস করিবার কিছুদিন পরেই আমীর আলি কলিকাতা প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। সামান্য কিছুকাল ঐ চাকুরী করিয়াই স্বাধীনচেতা যুবকের আর তাহা

ভাল লাগিল না। তিনি অমন লোভনীয় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ওকালতিতে প্রবেশ করিয়াই কাহারও ভাগ্যে তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীর কৃপালাভ হয় না। আমির আলিরও হইল না। কিন্তু তাহাতে তিনি হতাশ হইলেন না। বিশেষ অধ্যবসায়-সহকারে ঐ ব্যবসায়ে লাগিয়া রহিলেন। আমির আলির চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কখনও বাজে কাজে সময়-ক্ষেপণ করিতেন না। হাতে কাজ না থাকিলে আইনের পুস্তক লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতেন। ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁহার আইন-দক্ষতার পরিচয় লাভ করিতে লাগিল। ভাগ্যদেবীও তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। তাঁহার হাতে প্রচুর মকদ্দমা আসিতে লাগিল। তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যবহারাজীবি বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার অর্থাগমের পথ শতধারায় মুক্ত হইল।

ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভ এবং সঙ্গে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াও তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইল না। ব্যারিষ্টার হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তখন এদেশে ব্যারিষ্টারের এত আধিক্য ছিল না। সাতসাগর তেরনদী পাড়ি দিয়া অগাধ অর্থব্যয়ে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাওয়া অনেকেরই সাধ্যে কুলাইত না, অনেকে দেশের মায়া ছাড়িয়া যাইতেও রাজি হইতেন না। কিন্তু সৈয়দ আমির আলির এই সমুদয় প্রতিবন্ধক কিছুই ছিল না। তখন গভর্ণমেণ্ট বিশেষ বৃত্তি দিয়া মেধাবী ছাত্রদিগকে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাতে পাঠাইতেন।

জ্ঞান-পিপাসু আমির আলি এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এইরূপ একটি সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাতযাত্রা করিলেন।

স্বীয় প্রতিভা-বলে আমির আলি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স তেইশ কি চব্বিশ বৎসর। তরুণ যুবক অদম্য পরিশ্রম এবং বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেশের বিবিধ প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগদান করিয়া সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পর বৎসর তাঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের মুসলমান-আইনের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করা হয়। পাঁচ বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি ঐ কার্য্য করেন। এই সময় হইতে মুসলমান-সমাজের নানা হিতকর কার্য্যে তিনি মনোনিবেশ করেন্। এই সমুদয় কার্য্যে তাঁহার যেমন ছিল গভীর আন্তরিকতা, তেমনই ছিল অসীম উৎসাহ।

মুসলমান-সমাজের বিবিধ কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে "কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান-সঙ্ঘ" নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল তিনি এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় এই সমিতি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের বহু হিতসাধন করে। হাজী মহম্মদ মহসীন-প্রতিষ্ঠিত হুগলীর

ইমামবাড়ার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি-পদে তিনি সুদীর্ঘ-কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টারী করার পর গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অন্যতম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। এই কার্য্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ায়



তিনি অস্থায়িভাবে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। শত হইলেও চাকুরি,—দাসত্ব। সরকারী-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তিনি দেশহিতকর বা সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে যথোচিত ভাবে যোগদান করিতে পারিতেন না। এইভাবে সমাজ বা

দেশহিতৈষণা হইতে দূরে থাকায় তাঁহার বিবেকবুদ্ধিতে বড় আঘাত লাগিত। তাই তিনি প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পাকা হইবার সময়েই উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে আমির আলি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এই পদ পাইয়া তিনি কৃতার্থবোধ করিলেন না; অনেকে যেমন জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে ব্যাবস্থাপক সভায় প্রবেশলাভ করিয়া দেশ ও দশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কেবল স্বার্থসাধনাই প্রদান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, আমির আলির হৃদয় সে উপাদানে গঠিত ছিল না। তিনি জনসাধারণের বহু কল্যাণকর্ম্মে যত্নপর ছিলেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হন। এই সময় তাহার চেষ্টায় 'ওয়াকফ্' আইনের সংস্কার সাধিত হইয়া ভারতীয় মুসলমান-সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ঠাকুর-আইনের' অধ্যাপকের গৌরবময় পদ প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৮। সালে ভারত-সরকার আমির আলিকে সি. আই. ই. উপাধি দান করেন।

ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম আইনজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ সরকার বাহাদুর আমির আলিকে হাইকোর্টের গৌরবময় বিচারপতির পদ প্রদান করেন। এই পদের মর্য্যাদা তিনি এমন কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় প্রবীণ বিচারকেরা পর্য্যন্ত তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি এই গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবসর গ্রহন করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আমির আলি বিলাতে গমন করেন, সেখানেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয়। ১৯০৯ সালে তিনি বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারক পদ লাভ করেন। ইহা তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। এই পদ লাভ করিয়া তিনি যেমন নিজকে গৌরবান্বিত করেন, তদ্রূপ ভারতমাতারও মুখ উজ্জ্বল করেন, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এই উচ্চ গৌরবময়-পদলাভে সমর্থ হন নাই।

বিলাতে অবস্থান করিয়াও তিনি দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, কিসে বিদেশে ভারতবাসীর সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, ভারতবর্ষ কিসে বিশ্বের দরবারে সমান আসন লাভ করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক কামনা। এইজন্য তিনি চেস্টার ত্রুটি করেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি তথাকার 'ভারতীয় মুস্লিম লীগ'-শাখার সভাপতিরূপে সমাজের ও স্বদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

সাহিত্য-চর্চ্চা আমির আলির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কর্ম্মবহুল জীবনের সামান্য অবসরের মধ্যে তিনি মুসলমানের আইন ও ধর্ম্মবিষয়ে ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী ভাষায় ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার রচিত কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ আছে।

১৯২৯ সালে বাংলার এই প্রতিভা-প্রদীপ্ত কৃতী সন্তান বিলাতে পরলোকগমন করেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া স্বীয় চেষ্টা এবং আগ্রহ-প্রভাবে তিনি যে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেরই গর্ব্বের বস্তু।

---

# স্যার আশুতোষ

আমরা বাঙ্গালী পরমুখাপেক্ষী পরপদানত জাতি। দীর্ঘকাল এই দাসত্বের বোঝা শিরে বহিয়া আমরা এতই অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের মধ্যে সত্যিকারের মানুষ খুব কমই জন্ম-গ্রহণ করেন। আমরা জন্মিয়াই শিখি আমাদের শ্বেতমহাপ্রভুদের অনুকরণ করিতে। তাহারা কি-ভাবে হাঁটে, কি-ভাবে পা ফাঁক করিয়া প্যাণ্টালুনের পকেটে দুই হাত পূরিয়া দাঁড়ায়, কি-ভাবে হাসে, কাসে, কথা বলে, কি-ভাবে টেবিল-চেয়ারে বসিয়া কাঁটা-চাম্‌চে ধরিয়া খায়, ইত্যাদি আয়ত্ত করিবার জন্য আমরা ভয়ানক-ভাবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সমুদয় সদ্‌গুণ আছে, যাহা সত্য সত্যই একটা জাতিকে বড় করে, তাহা শিক্ষা করার জন্য আমাদের মোটেই আগ্রহ নাই। বিজাতীয় সভ্যতার মোহে আমরা এমনই অন্ধভাবে মজিয়া রহিয়াছি যে, মাতৃভাষার চর্চ্চাকে পর্য্যন্ত আমরা অপমানজনক বলিয়া মনে করি। মাতৃ-ভাষায় আমাদের জ্ঞান থাকুক, বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু ইংরেজীতে যদি দুই-চারিটা বুলি আওড়াইতে না পারিলাম, তবেই যেন আমাদের জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়া মনে করি। সুদীর্ঘ পরাধীনতায় আমাদিগকে এমনই অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে যে, আমরা আমাদের ধর্ম্ম ভুলিয়াছি,

কর্ম্ম ভুলিয়াছি, ভাষা ভুলিয়াছি, দেশ ভুলিয়াছি, জাতি ভুলিয়াছি, ইস্ট-অনিস্ট—সবই ভুলিয়াছি।

এই দিশাহারা পথভোলা জাতিকে পথের সন্ধান দিতে, জাতীয়ত্বের আদর্শ শিক্ষা দিতে এক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাংলা-মায়ের কৃতী সন্তান স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরাধীন দেশে পরাধীন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি যে ব্যক্তিত্ব, যে তেজ ও যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অনেক স্বাধীন দেশেও তাহা দুর্ঘট।

ফরাসীদেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি আশুতোষ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিলে এই বঙ্গীয় ব্যাঘ্র ফরাসী ব্যাঘ্র 'ক্লেমেন্সু' অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেন। সমগ্র ইউরোপে কুত্রাপি তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি নাই।"—কত বড় কথা! কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা পরাধীন জাতি!

আশুতোষের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই অনাদৃতা মাতৃভাষা আজ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষাতেও স্থান পাইয়াছে। তিনি ভিখারিণী বঙ্গভাষা-জননীকে রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সহসা অকালে পরলোকগমন না করিলে হয়ত তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইত। আজ প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীরা যে ইংরেজী ব্যতীত আর সমুদয় বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তর-প্রদানের অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা মহাপুরুষ আশুতোষেরই দান। এইজন্য তিনি দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

ইংরেজী ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন এই মহাপুরুষ কলিকাতার

মঙ্গলা লেনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। পুত্রের ভাবি জীবন-গঠনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল অতিশয় প্রখর। যাহাতে পুত্র রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে দেশের মধ্যে একজন কৃতবিদ্য যশস্বী ব্যক্তিরূপে সম্মান লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য



গঙ্গাপ্রসাদ সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তৎপ্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

বাল্যকালে আশুতোষ পিতার দেখাদেখি ডাক্তারী-ডাক্তারী খেলিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন এইভাবে বাগানে পুকুরের ঘাটে বসিয়া কয়েকটি কাচের শিশিতে রঙীন জল পূরিয়া খেলা করিতে করিতে পুকুরের জলে পড়িয়া যান। ভগবানের অসীম দয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষিত হয়। তদবধি গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন।

বাড়ীতেই প্রথমভাগ শেষ করার পর আশুতোষকে চক্র-বেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পাঁচ-বৎসরের বালক প্রথম দিন বিদ্যালয়ে যাইয়াই আর তথায় যাইতে সম্মত হইলেন না। পিতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক উত্তর করিলেন "ও ত স্কুল নয়, ও যে যাত্রা, ওখানে যাইয়া কি হইবে ?"

কিছুদিন পূর্ব্বে আশুতোষ একস্থানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেখানে ভয়ানক হৈ-চৈ ও গোলমাল শুনিয়া তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যাত্রা কেবল গোলমাল ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথম দিন স্কুলে গিয়াই সেখানেও যখন ঐ প্রকার গোলমাল দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই যাত্রার কথাই মনে পড়িয়াছিল। একদিন যিনি সমগ্র বাঙ্গালীজাতির শিক্ষাসংস্কারের ভার স্বয়ং স্কন্ধে তুলিয়া লইবেন, জীবনের প্রথম দিন বিদ্যালয়ে যাইয়াই তিনি ইহার গলদ কোথায়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক গঙ্গাপ্রসাদ ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি ঘরের পরিবর্ত্তে আরও কয়েকটি ঘরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্লাস বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পড়াশুনায় আশুতোষের শৈশব হইতেই প্রবল অনুরাগ ছিল। অতি প্রত্যুষে তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া পিতার সহিত বেড়াইয়া আসিতেন। তারপর বই লইয়া পড়িতে বসিতেন। তাঁহার মেধা স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয় বৎসরের পাঠ বালক দুই বৎসরের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিলেন।

ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া না দিয়া গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে কিছু দিন গৃহে রাখিয়াই উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যাহাতে নানাবিষয়ে পুত্রের জ্ঞান স্ফূরিত হয়,—যাহাতে পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত বাহিরের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের অফুরন্ত রত্নরাজীর সন্ধান তিনি পাইতে পারেন, সেইজন্য গঙ্গাপ্রসাদ সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং তজ্জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন না।

সৎসংসর্গে মানুষকে যেমন উন্নত করে, তদ্রূপ আবার অসৎ সংসর্গও মানুষকে অধঃপতিত করিয়া থাকে। গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে অন্যান্য বালকদিগের সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন। কোনও বালককে তিনি তাঁহার নিকট আসিতে দিতেন না এবং আশুতোষকেও কাহারও বাড়ীতে যাইতে দিতেন না।

সহসা আশুতোষের পড়াশুনায় এক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বুকের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিনের জন্য আশুতোষের পড়াশুনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। গঙ্গাপ্রবাদ পুত্রকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মথুরায় পাঠাইয়া দিলেন।

শরীর সুস্থ হওয়ার পর আশুতোষ কলিকাতায় রওনা হইলেন। পথে মোগলসরাই ষ্টেশনে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বিদ্যাসাগরের নাম ও গুণের কথা আশুতোষ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে আর কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার-লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। এইবার সেই বিরাট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া এবং তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া আশুতোষ নিজকে ধন্য মনে করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বালকের সহিত দুই-চারিটি কথা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালক একদিন এক মহাশক্তিধর পুরুষ হইবেন। ইহার পর কলিকাতায় আবার যখন আশুতোষের সহিত তাঁহার দেখা হয়, তখন তিনি একখানি 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো' তাঁহাকে উপহার' দিয়া বলিয়াছেন, "মনোযোগ দিয়া পড়িও।" আশুতোষ সেই পুস্তকখানি দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মাথায় তুলিয়া লইলেন। মহাপুরুষের নাম-স্বাক্ষরিত সেই পুস্তকখানা আশুতোষ আজীবন যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। আজিও উহা আশুতোষের গৃহে পুস্তকাধারে যত্ন-সহকারে রক্ষিত আছে।

১৮৭৪ সালে দশ বৎসর বয়সে আশুতোষকে সাউথ সুবার্ব্বন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি এই সময় হইতেই তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ( বর্ত্তমান Class IX ) পড়িবার সময়েই আশুতোষ এফ. এ. পরীক্ষায় পাঠ্য গণিত-শাস্ত্রের প্রায় সমুদয় পুস্তকই শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই আশুতোষের প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি হাইকোর্টের জজ্ হইবেন। হাইকোর্টের জজ্ হইতে হইলে প্রথমে হাইকোর্টে উকীল হইতে হয়। সাধারণতঃ হাইকোর্টের খ্যাতনামা প্রবীণ উকীলেরাই জজের পদ লাভ করিয়া থাকেন। পুত্রের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে সেইরূপ গুণের অধিকারী করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ভাল উকীল হইতে হইলে তীক্ষ্ণ আইন-জ্ঞানের সহিত উত্তম বক্তৃতা-শক্তির প্রয়োজন। এইজন্য আশুতোষ শৈশব হইতেই যাহাতে বক্তৃতার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারেন, গঙ্গাপ্রসাদ সে বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। একখানি টেবিলের কাছে ছোট একখানি টুলের উপর দাঁড়াইয়া আশুতোষকে প্রত্যহ স্কুলের পাঠ আবৃত্তি করিতে হইত। বক্তৃতা-বিষয়ে কিছু কিছু পুস্তকও তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। কখনও কখনও ছোটখাট বিষয় লইয়া নিজে নিজে বক্তৃতাও করিতেন। এইরূপে তিনি শৈশব হইতে বক্তৃতার ক্ষমতা লাভ করেন। যে পুরুষব্যাঘ্রের ভৈরব-কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে ভারতের বহু সভাস্থল একদিন প্রকম্পিত হইত, তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল শৈশব হইতেই।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পনেরো বৎসর বয়সে আশুতোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কলেজের ছাত্রেরা সাধারণতঃ পোষাক-পরিচ্ছদে একটু আড়ম্বরপ্রিয় হইয়া থাকে, কিন্তু আশুতোষ ছিলেন সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। তাঁহার বেশভূষা ও চাল-চলন

ছিল অতি সাধারণ রকমের। উচ্চ-গণিত-চর্চ্চা করিতে হইলে ফরাসী ভাষা ভাল জানা দরকার। আশুতোষ সেইজন্য অধ্যাপক বুথের নিকট ঐ ভাষা শিক্ষা করেন।

তাঁহাকে অসুস্থ শরীর লইয়া এফ্. এ. পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল, কাজেই তিনি ঐ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ্. এ. পড়িবার সময়েই আশুতোষ কেম্বিজের এক গণিত-বিষয়ক পত্রিকায় গণিতসম্বন্ধীয় কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিলাতের পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক উহা বিশেষ-রূপে প্রশংসিত হয় এবং আশুতোষ এইজন্য বিলাতের এফ্. আর্. এ. এস্. এবং এফ্. আর. এস্. ই. এই দুইটি গৌরবজনক উপাধি লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী আর এই উপাধি লাভ করেন নাই।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবৎসরেই গণিতে এম্. এ. পরীক্ষা দিয়া শীর্ষ-স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উচ্চস্থান লাভ করেন। এই বৎসরেই তিনি এম্. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া দশ সহস্র টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

ঐ বৎসরেই তিনি বি. এল্. পাস করিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতী-ব্যবসায়ে ক্রমশঃই তাঁহার যশ ও সুনাম পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। আইন-সম্বন্ধে

গবেষণা করিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ 'ডক্টর অব্ ল' ( ডি. এল্. ) উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্যপদ লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ন্যায় অল্পবয়সে আর কেহই এই পদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন, জীবনে আর কখনও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর-আইনের' অধ্যাপক-পদ লাভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-আইন-কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টের গৌরব-ময় বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই পদের উপযুক্ত মর্য্যাদা তাঁহার হস্তে কখনও কলুষিত হয় নাই। আইনজ্ঞান, দয়া, উদারতা, সূক্ষ্মবিচার এবং আইনব্যবসায়ীদিগের সহিত ভদ্রব্যবহারে তিনি তৎকালীন বিচারপতিদিগের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুকালের জন্য প্রধান বিচার-পতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনরায় আইন-ব্যবসায়ে ব্রতী হন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আশুতোষ পর পর চারিবার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ লাভ করেন। ক্রমান্বয়ে এত অধিকবার এই পদলাভের গৌরব এপর্য্যন্ত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনসমূহের মধ্যে অন্যতম স্থান লাভ করিয়াছে, সে গৌরব একমাত্র স্যার আশুতোষেরই প্রাপ্য। আশুতোষের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে গড়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়। আশুতোষকে বাদ দিয়া ইহার কল্পনা করা অসম্ভব। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে এবং ইহার কথা চিন্তা করিলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে সেই বিরাট্ শক্তিধর মহাপুরুষ ব্রহ্মণ্য-দীপ্তি-সমুদ্ভাসিত আশু-তোষের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্রস্পর্শী দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, বিশাল বিজ্ঞান-কলেজ, প্রাসাদোপম ছাত্রনিবাস হার্ডিঞ্জ্ হোষ্টেল, পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগ, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন প্রভৃতি মহাপুরুষ আশুতোষেরই কীর্ত্তি। অনাদৃতা বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-কক্ষে প্রবেশাধিকার দিয়া অবশেষে তাহাকে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে স্থানদান এবং পৃথিবীর নানাদেশীয় ভাষাচর্চ্চার ব্যবস্থা, প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার ও গবেষণার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, প্রভৃতি আশুতোষ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত কিনা ভাবিবার বিষয়। এইরূপে আশুতোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্ববিদ্যার মিলন-মন্দিরে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

পোষাক-পরিচ্ছদে আশুতোষের কোনও প্রকার আড়ম্বর

ছিল না। হাইকোর্টে জজিয়তী করার সময় ব্যতীত আর কখনও তিনি বিজাতীয় পোষাক পরিধান করিতেন না। সভা-সমিতিতে সর্ব্বত্রই তিনি ধুতি, চাদর, কোট পরিধান করিয়া গমন করিতেন। এমন কি, যখন তাহাকে স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে সাহেবদিগের সঙ্গে একত্র ভারতের কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইত, তখনও তিনি তাঁহার সেই পোষাক পরিত্যাগ করেন নাই। এমনই প্রবল ছিল তাঁহার স্বাজাত্য-বোধ।

স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে যখন তিনি মহীশূররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তখন কমিশনের সভ্যগণের অভিনন্দনের জন্য রাজদরবারে একটি ভোজের ব্যবস্থা হয়। আশুতোষ সাধারণ বাঙ্গালীর পোষাকেই নগ্নমস্তকে সেই সভায় উপস্থিত হন। রাজমন্ত্রী দরবারের রীতি-রক্ষার জন্য তাঁহাকে একটি উষ্ণীষ পরিধান করার আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া অনুরোধ জানাইলে আশুতোষ জলদগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি বাঙ্গালী, আমার জাতীয় বেশ আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি দরবার পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নিজের বাসায় চলিয়া আসিলেন। মহীশূর-রাজ ব্যাপারটি অবগত হইয়া মন্ত্রীকে তজ্জন্য তিরস্কার করিলেন এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধসহ আশুতোষের নিকট যুবরাজকে পাঠাইয়া দিলেন। আশুতোষ তখন দরবারে উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

এইরূপ তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও স্বাজাত্য-বোধের পরিচয়

আশুতোষ স্বীয় জীবনে বহুবার দিয়াজেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-জীবনে এরূপ উদাহরণ একান্ত বিরল। বাঙ্গালী যদি আজ আশুতোষের ন্যায় জাতীয়তাবোধ-সম্পন্ন হইত, তবে এই দুরবস্থা তাহার আর বেশী দিন থাকিত না।

আশুতোষ একবার স্যাড্‌লার কমিশনের কার্য্যে আলিগড় গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি রেলগাড়ীর যে কামরায় আসিতেছিলেন, সেই কামরায় একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ মিলিটারী অফিসার ছিল, ধুতি-চাদর-পরা কালা আদমির সঙ্গে এক কামরায় ভ্রমণ তাহার পক্ষে নিতান্ত অস্বস্তিকর ও অপমানজনক বোধ হইতেছিল। কিয়দ্দূর আসার পর আশুতোষ একটু ঘুমাইয়া পড়িলে সেই শ্বেতপুরুষ আশুতোষের একপাটি নাগরা জুতা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে আশুতোষ জাগিয়া দেখিলেন, তাঁহার একপাটি জুতা অদৃশ্য হইয়াছে, ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। ইংরেজটি তখন ঘুমাইতেছিল, আশুতোষ তাহার আল্‌নায় ঝুলান কোটটি ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাহেব জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার কোট নাই। ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে আশুতোষকে কোটের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আশুতোষ গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিলেন,—"তোমার কোট আমার জুতা খুঁজিয়া আনিতে গিয়াছে।" সাহেব নীরবে বসিয়া রাগে জ্বলিয়া মরিতে লাগিল।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ

ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, একটা জাতির ভাষা দেখিয়া সেই জাতির সভ্যতা ও জ্ঞান-সম্পদ্ অনুমান করা যায়। যে জাতি যত বড়, তাহার ভাষাও তত ঐশ্বর্য্যশালিনী ও সুদূরপ্রসারিণী, সেইজন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় গৌরব বাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষাকে উন্নত করিতে হইলে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিতে হইবে, এই সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে প্রথম হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই তিনি এই বিষয়ে চেষ্টা করিতে থাকেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি পত্র দ্বারা এণ্ট্রান্স হইতে এম্. এ. পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বাঙ্গালা ভাষায় একটি পরীক্ষা লওয়া হউক এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনার পরীক্ষা গৃহীত হউক বলিয়া একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠান। চারিমাস পরে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভা হয়। সভায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আশুতোষ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় এবং তদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা একটা ভাষা! তার আবার পরীক্ষা!—দূর, দূর!"

সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ বলিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা লওয়া হইলে কেহ আর সংস্কৃত পড়িতে চাহিবে না, সংস্কৃত একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।"

মুসলমানগণেরও আপত্তি যথেষ্ট। তাঁহাদের বালকেরা

বাঙ্গালা ভাল জানে না, উর্দ্দু এবং পার্শীতেও তাহাদের জ্ঞান অল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ঢুকিলে মুসলমান-বালকেরা আর কোনও পরীক্ষাতেই পাস করিতে পারিবে না।

আশুতোষ একঘণ্টা ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনলবর্ষিণী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সতের জন সভ্য আশুতোষের বিরুদ্ধে এবং এগার জন আশুতোষের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং আশুতোষের সে-বার পরাজয় হইল।

আশুতোষ কিন্তু নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি একবার যাহা ধরিতেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। এই বিষয়েও কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। বহুদিন পরে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে এম্. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার প্রসার সাধন করিয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মুক্ত করিলেন।

আশুতোষ স্বীয় ব্যক্তিত্ব, তার্কিকতা, সংকল্প-সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতি গুণের জন্য **বাংলার বাঘ** নামে পরিচিত ছিলেন। এই সব গুণের জন্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করিয়া চলিতেন।

আশুতোষ ছিলেন ছাত্রবন্ধু। কত ছাত্র যে তাঁহার দয়ায় কৃতবিদ্য হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। ছাত্রদিগকে সত্যসত্যই তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাহাদিগের চোখের জল তাঁহার প্রাণকে ব্যথাতুর করিয়া

তুলিত। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য বহু ছাত্র কেবল অশ্রুপাতে তাঁহার চিত্ত জয় করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে।

তাঁহার গৃহদ্বার ছিল সকল শ্রেণীর জন্য সর্ব্বদা অবারিত। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলের সঙ্গেই তিনি দেখা করিয়া ধৈর্য্য-সহকারে তাহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। আজ-কাল বহু বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে কার্ড দিতে হয়, না হয়, দ্বারোয়ানকে খোসামোদ বা ঘুষে তুষ্ট করিয়া বাবুর দর্শন-লাভের সুযোগ করিয়া লইতে হয়। আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারে এসব বালাই ছিল না। এইজন্য তাঁহার গৃহে নিত্য তীর্থযাত্রীর ন্যায় ভিড় জমিত।

আশুতোষ বড় দানশীল ছিলেন। বহু দরিদ্র-পরিবার তাঁহার দানে রক্ষা পাইয়াছে। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বহু নির্গুণ ব্যক্তিও তাঁহার দয়ায় মহাগুণবান্ বলিয়া সমাজে আশাতীত সম্মানের অধিকারী হইয়াছে।

আশুতোষ জননীকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার আদেশ ব্যতীত তিনি কোনও কার্য্য করিতেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে তাঁহার মাতৃভক্তির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক সময়ে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন আশুতোষকে বিলাতে যাইয়া সেই উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আশুতোষ জননীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। জননী পুত্রের বিলাত-গমনে সম্মত হইলেন না। আশুতোষ লর্ড কার্জ্জনকে

জানাইলেন,—বিলাত-গমনে জননীর অমত। লর্ড কার্জ্জন প্রভুত্ব ফলাইয়া কহিলেন,—"ইহা স্বয়ং ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধির আদেশ।" আশুতোষ তেমনি দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন,—"তিনি জননীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে অসমর্থ, তা' সে আদেশ রাজপ্রতিনিধিরই হউক, অথবা তদপেক্ষা অপর কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরই হউক।"

বিবিধ বিষয়ের পুস্তকপাঠ ছিল আশুতোষের একটি প্রধান ব্যাধি। তিনি প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার পুস্তক কিনিয়াছিলেন। শুধু পুস্তকাগার ভূষিত করিবার জন্যই তিনি পুস্তক ক্রয় করেন নাই, সমস্তগুলি পুস্তকই ভালভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট্ পুস্তকালয়টি একটি দেখিবার সামগ্রী এবং ইহা বাঙ্গালীজাতির একটি গৌরবের বস্তু। আশুতোষ তাঁহার পুস্তকাগারের নাম দিয়াছিলেন, "বাণী-মন্দির।"

আশুতোষ ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মের অন্ধ গোড়ামি বা ভাণ ছিল না। বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় তিনি নিজে চণ্ডীপাঠ করিতেন। নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-আহ্নিক তাঁহার বাদ যাইত না।

আশুতোষের ন্যায় উপাধির সম্মান খুব কম লোকেই পাইয়াছে। তিনি জীবনে যত উপাধি পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার নামের সঙ্গে যোগ করিলে দাঁড়ায় এইরূপ—"অনারেবল জাষ্টিস্ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে-টি., এম্. এ., পি. আর. এস্., ডি. এল্., ডি. এস্-সি., পি-এইচ্. ডি., এফ্. আর. এ. এস্., এফ্. আর. এস্. ই., সি. আই. ই., ডি. লিট্., সি.

এস্. আই., সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী। 'স্যার' উপাধিটি খুব সম্মানজনক উপাধি। বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্প লোকই এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। 'স্যার' উপাধি-লাভের পর একদিন আশুতোষ এক বিবাহ-সভায় গিয়াছিলেন; সেখানে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে স্যার উপাধি-লাভের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আশুতোষ হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "উপাধিতে কি সম্মান বাড়ে? আমাকে যদি কেহ 'স্যার আশুতোষ' না বলিয়া 'মুখুজ্যে মশাই' বলিয়া ডাকে, তাহা হইলে আমি বেশী সম্মান বোধ করি এবং আনন্দ পাই।"

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডুমরাওনের মহারাজের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার পক্ষে একটি মকর্দ্দমার ভার লইয়া আশুতোষ পাটনায় গমন করেন। এই সময়ে তিন দিন মাত্র রোগ ভোগ করিয়া ২৫শে মে, রবিবার, সন্ধ্যার পর বঙ্গজননীর এই কৃতী সন্তান পাটনাতেই অমরধামে যাত্রা করেন। তাঁহার শবদেহ পরদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে বিরাট্ শোভাযাত্রা-সহকারে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। জনসমাজ ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার চিতাপার্শ্বে সজলনয়নে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের সভক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

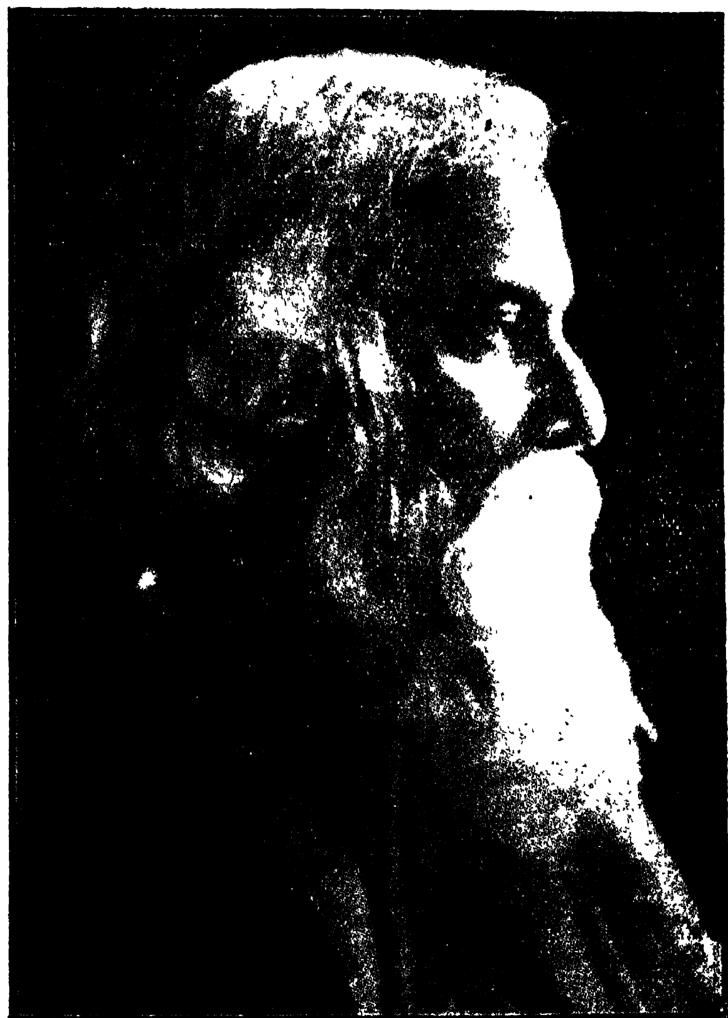
---

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে বহু প্রতিভান্বিত মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া নানা-ভাবে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভার সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে বিশ্বের নানাদিক্ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁহাদের সকল প্রতিভাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রতিভার প্রতীক্। বহুমুখী প্রতিভার এমন চমৎকার সমন্বয় আর কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত-রচয়িতা, সুরকার, গায়ক, গল্পলেখক, দার্শনিক ও রাজনীতিক। তিনি জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে এত অধিকসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। একই ব্যক্তির দ্বারা এত অধিক গ্রন্থরচনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। তিনি যে সমুদয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা এক ব্যক্তির পক্ষে তাহার সমগ্র জীবনে পাঠ করিয়া শেষ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বীয় অনন্য দুর্লভ প্রতিভাবলে তিনি আজ সমগ্র বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য এমনি ভাবে বিশ্বজনের চিত্ত জয় করিয়াছে যে, তাহারা বাংলাদেশকে বুঝিতে বোঝে রবীন্দ্র-নাথকে। কোনও বাঙ্গালী বিদেশে গেলেই তথাকার অধিবাসীরা

রবীন্দ্রনাথ:



সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, "Have you come from the land of Tagore?" অর্থাৎ "আপনি কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ হইতে আসিয়াছেন?" রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আজ বাংলাভাষা, বাঙ্গালী জাতি ও বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে সুপরিচিত। বাংলা-ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত। রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গাহিয়া আজ বিদেশবাসীরা তৃপ্তিলাভ করে, তাঁহার কবিতা পড়িয়া কৃতার্থ হয়। তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে আজ বোধ হয় বাঙ্গালী জাতি জগতের নিকট এমন গৌরবের সহিত পরিচিত হইতে পারিত না। গীতাঞ্জলি বিদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিয়া অজ্ঞাত বাংলাভাষাকে বিশ্বের ভাষা-দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াই বিদেশীয় বহু শিক্ষিত নরনারী আজ রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার সহিত পরিচয় লাভের জন্য বাংলাভাষা শিক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত। রবীন্দ্রনাথের জন্য যেমন আজ বাংলাভাষা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষা-সমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ আবার তাঁহারই অফুরন্ত দানে ও সৃষ্টি-মাহাত্ম্যে বাংলাভাষা অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই ঠাকুর পরিবার চিরদিন ধনে, মানে ও বিদ্যায় বঙ্গদেশে সুপরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম সারদাদেবী। দেবেন্দ্রনাথ পবিত্র চরিত্র-মাহাত্ম্যে ও ধর্ম্ম-প্রাণতায় বঙ্গদেশে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দটি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সকলেই যশস্বী; রবীন্দ্রনাথ সকলের কনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ ধনীর গৃহে জন্মিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল অতি সাধারণ ঘরের বালকের মত অতি অনাড়ম্বর সাদাসিধা ভাবে। কি খাওয়া-দাওয়া, কি পোষাক-পরিচ্ছদ, কি চলাফেরা, কোনও বিষয়েই বিলাসিতার স্পর্শ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভাই-বোনদের শৈশবকাল কিরূপ সাদাসিধাভাবে এবং কঠোর শাসনের মধ্যে অতিবাহিত হইয়া-ছিল, তাহা নিজে লিখিয়া গিয়াছেন,—"আহারে আমাদের সৌখীনতায় গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোন-দিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপর আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। আমাদের চটি জুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুইটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপাদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম। তাহাতে যাতায়াতের সময় পদ-চালনা অপেক্ষা জুতা-চালনা এত বাহুল্যভাবে হইত যে, পাদুকা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত।"

সারাদিন বাহির বাড়ীতে চাকরদের তত্ত্বাবধানেই তাঁহাদিগকে কাটাইতে হইত। রাত্রি ব্যতীত তাঁহাদের বাড়ীর মধ্যে মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। বাড়ীর বাহিরেও তাঁহাদের যাওয়ার অধিকার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ চাকরদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের মহলে আবদ্ধ হইয়া জেলে আবদ্ধ কয়েদীর মত বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। সেইখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া শিশু রবীন্দ্রনাথ দূরের গাছপালা, আকাশ, পুষ্করিণী, লোকজনের চলাচল যে ভাবে দেখিতেন, তাহা তাঁহার মনে নানা কল্পনার ছবি আঁকিয়া দিত। পরিণত বয়সে কবিজীবনে এই শিশুবয়সের দেখা পৃথিবীর রূপ তাঁহাকে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করিয়াছিল।

আহারাদির ব্যাপারেও শৈশবে কিছুমাত্র বাহুল্য ছিল না। এই ব্যাপারটিতেও চাকরদের কর্তৃত্বই ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাহারা ছেলেদের ভাগ্য যথাসাধ্য কমাইয়া নিজেদের অংশবৃদ্ধির যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। এইরূপে রবীন্দ্রনাথের শৈশব হইতেই অল্প আহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

পড়াশুনায় শিশু রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ ছিল না মোটেই। পড়িতে বসিলেই তাঁহার ঘুম পাইত। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের ভয়ে বালক সম্মুখে বই খুলিয়া রাখিয়া চোখ রগড়াইয়া কেবল ঘুম তাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। মাষ্টার মহাশয় অবশেষে হতাশ হইয়া বলিতেন,—না, তোমার কিছু হবে না, একটা আকাট মূর্খ হ'য়ে থাকবে তুমি। পড়াশুনায় অমনোযোগ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনেরাও

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরূপ ধারণাই মনে মনে পোষণ করিতেন।

স্কুলকেও রবীন্দ্রনাথ যমালয়ের অপেক্ষা বেশী ভয় করিতেন। সেখানে বেশীক্ষণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখা যাইত না। স্কুল-পালানো তাঁহার একটা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে স্কুল তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক মনে না হওয়ায়, সেখান হইতে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও রবীন্দ্রনাথের মন আকৃষ্ট হইল না। কাজেই সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত হইলেন 'বেঙ্গল একাডেমী' নামক একটা ফিরিঙ্গী স্কুলে এখানেও রবীন্দ্রনাথের কোনও উন্নতি দেখা গেল না, বরং স্কুল পলায়ন প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং অভিভাবকেরা হতাশ হইয়া তাঁহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বাড়াতে গৃহ-শিক্ষকের নিকট পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মন কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি শ্লেট লইয়া বসিয়া যেমন-করা একটু কিছু মিল দিয়া কবিতা লিখিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার মন কবিতার দিকে গভীরভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে। তাঁহার এক-একখানি কবিতার খাতা ছিল। প্রথমতঃ শ্লেটে -কবিতা লিখিয়া যে কবিতাটি তাঁহার বেশী মনপূতঃ হইত তাহা তিনি খাতায় নকল করিয়া রাখিতেন। কবিতা শুধু খাতায় নিবন্ধ করিয়া শিশু কবির হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না। কাহাকেও শুনাইতে

না পারিলে কবিতা লিখিয়া সুখ ও আনন্দ কোথায় ? কাজেই যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেন শিশু কবি তাঁহাকেই ধরিয়া বসাইতেন তাঁহার লেখা কবিতা শুনাইতেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ছিলেন কবিতা রচনার একজন প্রধান উৎসাহদাতা। রবীন্দ্র-নাথের বয়স যখন নয় বৎসর তখনই তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পনেরো ষোল বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। কিশোর কবির বহু রচনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বৌদির নিকট রীতিমত গান-বাজনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কালে এই সঙ্গীতশক্তি কূলপ্লাবিনী নদীর ধারার ন্যায় বিশ্বকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। আজ রবীন্দ্র সঙ্গীতের এমন প্রভাব যে, তাহা না হইলে সভা-সমিতির উদ্বোধন হয় না, সামাজিক আসরও জমে না,—রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরলহরী আজ বাংলার প্রভাত ও সন্ধ্যা-সমীরকে মদির-মুগ্ধ করিয়া তোলে।

একদিন বালক রবীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি সঙ্গীত শুনিয়া পিতা দেবেন্দ্রনাথ এতই মুগ্ধ হন যে তিনি সকলকে বলিয়াছিলেন, "দেশের রাজা দেশের ভাষা জানিলে, আজ কবিকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতেন; কিন্তু সে যখন হইবার নয় তখন আমাকেই ইহার পুরস্কার দিতে হইবে।"—এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশত টাকার চেক্ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করেন।

সতের বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাতে পাঠান হয়। সে সময় তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী ও পুত্রকন্যারা বিলাতের ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই স্কুলে রবীন্দ্র-নাথের বেশী দিন পড়া হয় নাই। কিছুদিন পরে তাঁহাকে লণ্ডন শহরের একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। বিলাতে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ রচনার বিরাম ছিল না। "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি সেখান হইতে নিয়মিত-ভাবে কবিতাদি পাঠাইতে থাকেন।

প্রায় দেড় বৎসর বিলাতে থাকার পর পিতার পত্র পাইয়া রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের আলোক ও বাতাস পাইয়া রবীন্দ্রনাথের মন যেন প্রভাত-পাখীর মত আনন্দে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি প্রাণ খুলিয়া লিখিতে ও গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার আয়োজন হইল। যাত্রা করিয়া তিনি মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু কোনও কারণবশতঃ সেখানেই যাত্রা স্থগিত রাখিয়া পিতার নিকটে মসূরি পাহাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রের এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনে পিতা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র তিরস্কার করিলেন না, বরং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল, পুত্রের ফিরিয়া আসায় তিনি খুসিই হইয়াছেন।

এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-তরণী পূরামাত্রায় পাল তুলিয়া উজান বাহিয়া চলিল। কবি কখনও পাহাড়ে, কখনও

সমুদ্রতীরে তখনও নদীবক্ষে কাটাইয়া কবি নিজেকে কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া রাখিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" ও "প্রভাত -সঙ্গীতের" গানগুলি বেশীর ভাগই এই সময়ের রচনা।

এই সময়ে ( ১৮৮৩ খৃঃ অঃ ) খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহীর বেণীমাধম রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

অফুরন্ত কবিতা, সঙ্গীত. গল্প,প্রবন্ধও নাটকের সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনের ত্রিশটি বৎসর কাটিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার তাঁহার নব নব বিচিত্র দানে সম্পদশালী হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার নবযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময় তাঁহার শান্ত-শীতল কবি-জীবনে আসিল একটা বিপ্লবের সূচনা। পিতা তাঁহাকে জমিদারী পরিদর্শনের ভার প্রদান করিলেন। কোথায় কবি-কুঞ্জের মলয় সেবিত, কুসুম-গন্ধামোদিত, কোকিল-কুহরিত পরম শান্তির জীবন, আর কোথায় কঠোর জমিদারী-ভারগ্রস্ত নীরস কর্ম্ম-নিপীড়িত নিছক সাংসারিক জীবন! ভাল না লাগিলেও রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

তাঁহার কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচিত হইল শিলাইদহে। পদ্মাতীরে প্রকৃতির অফুরন্ত দানে ভরপূর গ্রামখানি। পদ্মাবক্ষে একখানি বোটেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত। যে কর্ম্মজীবনকে তিনি প্রথমে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই শেষে তাঁহার পক্ষে পরম

উপাদেয় মনে হইতে লাগিল। পদ্মার তরঙ্গচঞ্চল লীলায়িত রূপ, চরার উপরের কাশবনের শুভ্র হাসি, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম শোভা, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দ্বিপ্রহরের দীপ্তমূর্ত্তি, প্রভাতের প্রাণারাম সৌন্দর্য্যের উন্মুক্ত মণিভাণ্ডার, রাত্রের অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার অপরূপ নগ্ন ছবি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মনকে ভুলাইয়া আপন করিয়া লইল। এইখানে আসিয়াই তিনি বাংলা মায়ের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইলেন। তাঁহার যত শ্রেষ্ঠ রচনা সে সমুদয়ের জন্মলাভ হইল এইখানেই। যে গীতাঞ্জলীর ভাবময় মধুর সঙ্গীতগুলি তাঁহাকে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পুরস্কার দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্ববরেণ্য করিল, তাহাদেরও সৃষ্টি এইখানে।

পদ্মা তাঁহার জীবনের সহিত এমন মধুময় সম্পর্ক পাতাইয়া তুলিয়াছিল যে, এ জন্মে তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই; এমন কি, পরজন্মেও তিনি আবার এই পদ্মাতীরেই ফিরিয়া আসার কামনা করিয়া গিয়াছেন—

"কতদিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,

*    *    *    *

জন্মান্তরে শতবার যে-নীর্জন তীরে
গোপনে হৃদয়ে মোর আসিত বাহিরে,—
কতবার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়?"

এইখানে আসিয়াই বাংলার সাধারণ রূপ রবীন্দ্রনাথের

চোখে ধরা পড়ে। তিনি বুঝিতে পারেন, বাঙ্গালী কত দরিদ্র, কত অসহায়, শিক্ষার আলোকে তাহারা কিরূপ বঞ্চিত। এই উপলব্ধিই তাঁহার কল্পনা-রঙীন হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য। তাই কবি দৃঢ়কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

"এই সব ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

গরীব প্রজাদের উপর তাঁহার কতখানি দরদ, কত উদার মমতা তাহার পরিচয় পাই আমরা তাঁহারই নিজের লেখায়,—

"এই সমস্ত অনুরক্ত প্রজাদের মুখে রড় একটি কোমল মাধুর্য্য আছে। বাস্তবিকই এরা যেন একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভূষাদের আপনার লোক ব'লে মনে করতে একটা সুখ আছে। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা' এরা জানে না।—সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মত, তার মধ্যে স্নান ক'রে সংসারের অনেক তাপ দূর হ'য়ে যায়।"

১৯১২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবিগণ তাঁহাকে এক বিশেষ উৎসবে অভিনন্দিত করেন। স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত গজদন্তে লিখিত অভিনন্দন-পত্রের সহিত একটি স্বর্ণপদ্ম কবিকে উপহার দেওয়া হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেরূপ একটি স্মরণীয় ও গৌরবময় বৎসর, তদপেক্ষা গৌরবের বৎসর সমগ্র এসিয়া-বাসীর। এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও এসিয়াবাসী এই পুরস্কার লাভ করেন নাই।

আলফ্রেড্ নোবেল সুইডেনের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিদ্ ছিলেন। তিনি অতি অল্প ব্যয়ে ও সহজ উপায়ে ডিনামাইট প্রস্তুতের কৌশল আবিষ্কার করিয়া অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার অর্জ্জিত সেই বিপুল অর্থ আত্মীয়স্বজনদিগকে না দিয়া এক উইল করিয়া যান যে, সেই সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি বৎসর সাহিত্য, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং জগতের শান্তিরক্ষা এই পাঁচটি বিষয়ে যাঁহারা মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে পাঁচটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এক একটি পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। নোবেলের নামানুসারে ঐ পুরস্কারের নাম হয় 'নোবেল-পুরস্কার'। 'সুইডিস্ একাডেমী' নামক একটি সমিতির উপর এই পুরস্কার প্রদানের ভার অর্পিত আছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কারটি প্রথম প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হয়।

নোবেল পুরস্কার লাভের পর রবীন্দ্রনাথের নাম ও খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানী ও গুণিসমাজ তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। এইরূপে অপরিচিতা অনাদৃতা বাংলাভাষা বিশ্বের ভাষার দরবারে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

বিশ্বের জ্ঞানিসমাজ রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের সন্ধান পাইয়া তাঁহার মুখে সেই অমৃতের বাণী শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের দেশে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ-লিপি আসিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি সুদূরের ডাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ১৯১৬ সালের মে মাসে তিনি যাপানে যাত্রা করিলেন। পথে নানাস্থানে তিনি বিপুল রাজসম্মানে অভ্যর্থিত হইলেন। সুদূর দেশবাসীরা বাঙ্গালী বিশ্ববরেণ্য কবিকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইল। জাপানেও তাঁহার বিপুল অভ্যর্থনা হইল। সাড়ে তিন মাস জাপানে কাটাইয়া কবি চলিলেন আমেরিকায়।

আমেরিকায় কবির প্রায় ৬।৭ মাস অতিবাহিত হয়। সেখানে বিভিন্ন সভায় সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তিনি বক্তৃতা করেন। কবির মুখে তাঁহারা ভারতের চিরন্তনী অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া কবিকে হৃদয়ের সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পরে কবি পাইলেন ইউরোপ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র। ১৯২০ সালে তিনি ইংলণ্ড-যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র নানাস্থানে কবির সংবর্দ্ধনার ব্যাপার অতি সমারোহে চলিতে লাগিল। প্রত্যেক সভাতেই জনসমাগমে তিলধারণের স্থান থাকিত না। সেখান হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল আমেরিকা হইতে।

কবি আমেরিকা যাইয়া তাঁহার বাণী শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। আমেরিকা হইতে আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন ইউরোপে। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ-পত্র পাইতে লাগিলেন। যখন যেখানে গেলেন, সেইখানেই রাজাধিরাজের বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। জড়বাদী ইউরোপ ভারতের কবির মুখে নূতন বাণী শুনিয়া যেন নূতন জগতের সন্ধান পাইল।

১৯২১ সালে ইউরোপের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া কবি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আসিল চীনদেশের নিমন্ত্রণ। কবি রেঙ্গুণ, মালয়, সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইয়া চীনদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতা এবং উভয় দেশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কবির জন্মদিন উপলক্ষে চীনদেশের লোকেরা তাঁহাকে বহু মূল্যবান্ সামগ্রী উপহার প্রদান করেন। তাঁহারা কবিকে চীনা ভাষায় নাম প্রদান করেন—'চু চেন তান' অর্থাৎ 'বজ্রের মত শক্তিশালী ভারতসূর্য্য'।

ইহার পর কবির নিমন্ত্রণ আসে ইটালী হইতে। ইটালীর তৎকালীন জননেতা মুসোলিনী তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। তথায় সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ও বক্তৃতা দিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

কিছুদিন পরে নিমন্ত্রণ আসিল ভারতীয় পূর্ব্বদ্বীপাবলী

হইতে। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপসমূহ প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও সভ্যতার লীলাভূমি। কবি এই সমুহ দেশে প্রাচীন ভারতীয়গণের কীর্ত্তিরাজি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। তত্রত্য দেশবাসীরাও কবির মুখে ভারতের বাণী শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করে। সেখান হইতে শ্যামদেশের নিমন্ত্রণে তথায় গমন করেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ চলিলেন রাশিয়ায়। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর, কিন্তু বার্দ্ধক্যের অবসাদ তখনও তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। তরুণের মতই তাঁহার হৃদয় উদ্দীপনায় ভরপূর। নবজাগ্রত রাশিয়ায় ভ্রমণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। সেখানে তিনি যে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁহার রাশিয়ার ভ্রমণ-কাহিনী 'রাশিয়ার চিঠি' নামক একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাশিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কবি চলিলেন পারশ্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে। কবির এবারকার যাত্রা আকাশপথে। রাজকীয় আড়ম্বরে কবি তথায় অভ্যর্থনা লাভ করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষবার বিদেশ-ভ্রমণ।

বিশ্বের নানা বিচিত্র দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্বকবি বিশ্বের সহিত আরও নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ হইলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই;

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।”

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ও বিদেশ হইতে বহুপ্রকার সম্মানলাভ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারতসরকার তাঁহাকে **‘স্যার’** উপাধি দান করেন। কলিকাতা, ঢাকা ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে **‘ডি-লিট্’** উপাধিভূষণে ভূষিত করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে কবিকে **‘কবি সার্ব্বভৌম’** উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে **‘ডি-লিট্’** উপাধি দান করেন।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ছিল অনন্ত প্রবাহিত জাহ্নবা-ধারার মত। বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জনের সময়ে বাংলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ দেশময় বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহারই নাম ‘স্বদেশী আন্দোলন’। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন প্রথার সৃষ্টি করিলেন। বিদেশী বর্জ্জনের জন্য সভায় সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে নগ্নপদে তিনি রাখীবন্ধনের দিনে শোভাযাত্রায় বাহির হইলেন। বহু গান, বহু প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে বাহির হইতে লাগিল। তখনকার প্রত্যেক স্বদেশী সভায় রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীত প্রত্যেকের হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিত। দেশের জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনও কারাবরণ করেন নাই সত্য। জেল খাটাই বড় দেশ-

ভক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে দেশভক্তির যে নির্ঝর সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত, দেশসেবার নামে জেলে-যাওয়া খুব কম লোকের মধ্যেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রকৃত দেশভক্ত, প্রকৃত দেশ-প্রেমিক। তিনি আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে, কথাবার্ত্তায়, বক্তৃতায়, রচনায় কখনও বাঙ্গালিত্ব বিসর্জ্জন দেন নাই। দেশের যথার্থ উন্নতির জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিত। দেশবাসীর উপর রাজকীয় অন্যায় অত্যাচার অথবা অমর্য্যাদাকর আচরণ কখনও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শরাহত সিংহের ন্যায় বিরাট্ গর্জ্জনে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদস্বরূপ সরকারপ্রদত্ত 'স্যার' উপাধি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন; জীবনে আর কখনও তিনি তাহা ব্যবহার করেন নাই; কেহ তাঁহার নামের সহিত স্যার উপাধি ব্যবহার করিলে তিনি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইতেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পত্র বিতরণ-উৎসবে ( কন্‌ভোকেশন ) রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহার পূর্ব্বে এবং পরে এ পর্য্যন্ত আর কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ-পাঠ হয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে কিরূপ ভালবাসিতেন। বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথকে যে সব সভা-সমীতিতে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে তাহা তিনি সমস্তই দিয়াছেন বাংলা ভাষায়। বাঙ্গালীদিগের নিকট যে সব চিঠি-পত্র

লিখিয়াছেন তাহাতেও তিনি ইংরাজী ভাষা বা রীতির আশ্রয় লন নাই। অথচ ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে রবিন্দ্রনাথের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁহার বিদেশের বক্তৃতা এবং অ-বাঙ্গালীদের নিকট লিখিত চিঠি-পত্র পড়িলেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীর পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে কবির আশী বৎসর পূর্ণ হইল, তিনি একাশী বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই অশীতি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র বিপুল সমারোহে তাঁহার জন্ম তিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বদেশ ও বিদেশ হইতে তাঁহার নিকট বহু সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপক তার ও পত্র আসে। মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন যে, তিনি কবিকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি গুরুদেবের অশীতিবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"আপনার জীবনের চার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। পাঁচ কুড়ি বৎসর জীবিত থাকুন, এই প্রার্থনা।" রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখিলেন,—চার কুড়ি বছর বেঁচে থেকে যথেষ্ট বেয়াদপি ক'রেছি, পাঁচ কুড়ি বাঁচলে সেটা অসহ্য হ'য়ে উঠবে।" কবির অশীতি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে 'কবি-ভাস্কর' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন।

পূর্ব্ব হইতেই কবির শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। একাশী বৎসরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুন ও জুলাই মাস কোনও রকমে কাটিল। কিন্তু আগষ্ট মাসেই তাঁহার পীড়া এমন আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি

পাইল যে, সকলেরই মনে হইল, এইবার বাংলার রবি বাংলাকে অন্ধকার করিয়া অস্তমিত হইবে।

৭ই আগষ্ট ( বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ ) বৃহস্পতি-বার বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ নিজ বাসভবনে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। সেদিন আমরা যে কি জিনিষ হারাইয়াছি আজও তাহার পরিপূর্ণ উপলব্ধির দিন আসে নাই। রবীন্দ্রনাথ যে কি ছিলেন, কত বড় বিরাট প্রতিভা লইয়া তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আর কি রত্নভাণ্ডার তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক্ বিচার বহুকাল সাপেক্ষ।

এই বিরাট্ মহামানবের চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় এই সামান্য প্রবন্ধে ত সম্ভবই নয়, মহাকায় গ্রন্থেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার এক একটি দিক্ লইয়াই এক একটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ কীর্ত্তি 'শান্তি নিকেতন' ও 'বিশ্বভারতী'। বোলপুরে ইহা অবস্থিত। ১৯০১ সালে মাত্র ৪।৫টি ছাত্র লইয়া বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তি নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্র-নাথের অক্লান্ত চেষ্টায় ক্রমে এই সামান্য আশ্রমটি একটি বিরাট্ আদর্শ বিদ্যাভবনে পরিণত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কবি ভারতের প্রাচীন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার অনুকরণে এখানে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্বভারতীকে বিশ্বের যথার্থ বিদ্যাগাররূপে গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা কবি

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। এইটি ছিল তাঁহার একান্ত প্রাণের সামগ্রী।

বিশ্বভারতী যেমন বিশ্বের বিদ্যালোচনার একটি বিদ্যাপীঠ, তদ্রূপ আবার ইহা বিশ্বমানবের মহামিলনের কেন্দ্রভূমি। এখানে পৃথিবীর নানা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বিদ্যালোচনার জন্য সমবেত হইয়া থাকেন। দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিত এখানকার অধ্যাপক, দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানপিপাসু এখানকার ছাত্র। বাংলা, সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, গুজরাটি, মৈথিলী, সিংহলী, ফার্সি, আরবী, ইংরাজী, ফরাসী গ্রীক, জার্ম্মান, ইটালীয়, চৈনিক ইত্যাদি সকল প্রকার ভাষার আলোচনার ব্যবস্থা এখানে আছে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার একটি অমূল্য সম্পদ্। পৃথিবীর নানা দেশের উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ এখানে সংগৃহিত আছে। বহু দেশ-বিদেশ হইতে নানাবিধ মূল্যবান্ পুস্তক তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে উপহার পাঠাইয়াছেন। বিশ্বভারতীর তুলনা পৃথিবীতে দুর্ঘট।

যদি বাঙ্গালী জাতি কবির এই একান্ত প্রাণের সামগ্রীকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে আপ্রাণ চেষ্টিত থাকে, তবেই কবির প্রতি তাহাদের যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হইবে।

# আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আমাদের ভারত আর্য্যভূমি, ত্যাগ ও কর্ম্মের পবিত্র উজ্জ্বল আলোক এই ভারতের আকাশ, বন, পর্ব্বত, জলস্থল চিরপ্রদীপ্ত। কত ত্যাগী মহাপুরুষ এই পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা এই মাতৃভূমিকে গৌরব গরিমায় বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এই বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব ঋষি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মপ্রভাবে স্বদেশে ও বিদেশে ইহার গৌরব বিস্তার করিয়া বঙ্গজননীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

আমরা যে মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিব, ত্যাগে, সমাজ ও স্বদেশসেবায়, জ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের দানে তিনি এই বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ত্যাগ, সেবা, দান ও জ্ঞানব্রতের মহামহিমান্বিত আদর্শে সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালী জাতীর ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি তাঁহার জাগরণে ধ্যান ও নিদ্রায় স্বপ্ন ছিল। সে ধ্যান ও স্বপ্ন তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। কিসে চিরদরিদ্র, অবহেলিত বাঙ্গালী সন্তানের দৈন্য-দারিদ্র্য ঘুচিবে, কিসে বাঙ্গালী পর্য্যাপ্তপরিমাণে অন্নবস্ত্রের মুখ দেখিতে পাইবে, কিসে বাঙ্গালী শক্তিশালী হইবে, কিসে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, ইহাই ছিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমগ্র জীবনের ব্রত।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে) খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি গ্রামে এক বিখ্যাত কায়স্থ বংশে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরিশচন্দ্র রায় একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশ ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনে তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। স্বীয় গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি স্বগৃহে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। দানধ্যান ও পুণ্যকর্ম্মে তিনি সে অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রগতি-পক্ষপাতী, সে যুগের রক্ষণশীল অনুদার ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার এই গুণের পূর্ণমাত্রায় উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যকালের নাম ছিল ফুলু। এই শিশু ফুলু এবং পরিণত বয়সের স্যার পি. সি. রায়ের মধ্যে কিন্তু ছিল ভয়ানক পার্থক্য। ফুলু ছিলেন দুরন্ত ডানপিটে ছেলে। গ্রামে পাড়াপ্রতিবেশীদের প্রতি তাঁহার দুরন্তপনার অন্ত ছিল না। কিন্তু সেই দুরন্তপনার মধ্যে ছিল ভবিষ্যৎ প্রতিভা-বিকাশের একটা ইঙ্গিত।

চারি বৎসর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সুনিপুণ শিশু-শিক্ষকের হস্তে বালক ফুলুর শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। সেই দিন হইতে প্রফুল্লচন্দ্রের যে ছাত্রজীবনের সূচনা হইল, মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তাহার বিরাম ছিল না। তিনি ছিলেন আজীবন ছাত্র। পুস্তক ও অধ্যয়ন ছিল তাঁহার নিত্য সহচর। তিনি

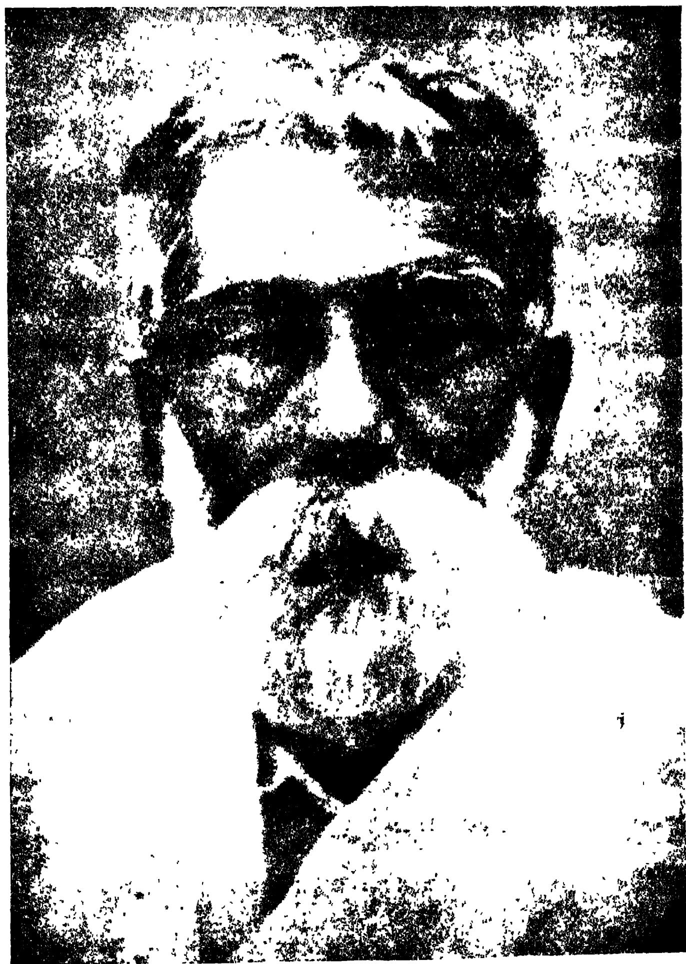
ছিলেন চির জ্ঞান-তপস্বী, আর ছাত্রেরা ছিল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বন্ধু।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। সে জীবন ছেড়ে জীবনে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ ক'রেছি ব'লে মনে হয় না। জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্র ভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চ'লে গেছে বুঝতে পারিনি, আজ বার্দ্ধক্যে পাদিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে তু'ঘণ্টাকাল ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা-কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা-কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহত।"

গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র স্বগৃহের পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার এই প্রথম শিক্ষার বিদ্যায়তনটির প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রদ্ধা শেষ পর্য্যন্ত সমভাবেই বর্ত্তমান ছিল। উত্তর জীবনে যখন তিনি জ্ঞানে, মানে, যশে পৃথিবীবিখ্যাত হইলেন, তখন এই বিদ্যালয়টির নূতন ভাবে সংস্কার করিয়া উহার ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য আগা-গোড়াই ভাল ছিল না। এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহার পড়াশুনায় ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। কিন্তু বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াও তিনি

পুস্তকপাঠে বিরত থাকিতেন না। নিজে স্বাস্থ্য-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াই তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপদেশ দিতেন।



হেয়ার স্কুলে চারি বৎসর পড়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র এলবার্টস্কুলে

ভর্ত্তি হইলেন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রপলিটন কলেজ (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে এফ্. এ. পরীক্ষায় পাস করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানকার কলেজের পাঠ শেষ করিয়া 'গিল ক্রাইষ্ট' বৃত্তি (Gilchrist Scholarship) লইয়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন।

ছয় বৎসর বিলাতে অবস্থানের পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান-শাস্ত্রে "ডি-এস্-সি" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী মাত্র এই উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐ বৎসরেই প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত হইয়াই তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে নব নব অজ্ঞাত তত্ত্ব নির্ণয়ে মনোযোগী হইলেন। ধ্যাননিরত মহাসাধকের ন্যায় এক একটি তত্ত্বের গবেষণা লইয়া তিনি অনাহারে অনিদ্রায় দিবস-রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সাধনার ফল ফলিল।

যেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, সেই দিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজে একটা তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। যে তত্ত্বের কথা তাহাদের প্রবীণ মস্তিষ্কে ধারণাও হয় নাই, তাহা আবিষ্কার করিলেন একজন তরুণ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক! একরূপে

প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া একজন প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার যশ সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িল এবং তিনি জগতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার, তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইল।

প্রফুল্লচন্দ্র কেবল নিজে বড় হইয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। তিনি স্বহস্তে বহু কৃতী বৈজ্ঞানিক গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সেই শিষ্যগণ পৃথিবীতে "বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী" নামে বিখ্যাত। তাহার বিখ্যাত ছাত্রদিগের মধ্যে আমরা ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী, ডাক্তার রসিকলাল দত্ত, ডাক্তার নীলরতন ধর, ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নামে গৌরব বোধ করিতে পারি।

প্রফুল্লচন্দ্র তাহার ছাত্রদিগের গৌরবে নিজেকে অসীম গৌরবান্বিত মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ কালে বিদায় অভিনন্দন-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা জান যে, আমি কখনও জাগতিক ধনসম্পত্তি খুব সাবধানে ব্যবহার করিনি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে এতদিন চাকরীর পর আমি কি ধন-দৌলত সঞ্চয় ক'রেছি?—তাহলে আমি ইতিহাসের কর্ণেলিয়ার (Cornelia) ভাষায় উত্তর দেব। তোমরা নিশ্চয় কর্ণেলিয়ার গল্প জান; এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক তার কাছে এসে গর্ব্বের সঙ্গে তার ধন-দৌলত কর্ণেলিয়াকে দেখাচ্ছিল এবং তার কি সম্পত্তি

আছে দেখাতে অনুরোধ কচ্ছিল। তাতে তিনি যে পর্য্যন্ত না তার ছেলেরা আসে ততক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। যখন ছেলেরা স্কুল থেকে এল, তখন কর্ণেলিয়া তাদের দেখিয়ে বল্লেন, 'এরাই আমার ধন-দৌলত!'—আমিও কর্ণেলিয়ার মত একজন রসিকলাল দত্ত, একজন নীলরতন ধর, একজন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, একজন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়ে বল্‌ব— "এরাই আমার ধনরত্ন।"

প্রথম হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের ঝোঁক ছিল ব্যবসায়ের দিকে। বাঙ্গালীকে ব্যবসায় শিক্ষায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন। রসায়ন বিদ্যাকে কাজে খাটাইয়া একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে প্রফুল্লচন্দ্র নিজের সঞ্চিত মাত্র আটশত টাকা লইয়া একটি ঔষধ প্রস্তুতের ছোট কারখানা খোলেন। তাহার অসীম অধ্যবসায় এবং একান্ত চেষ্টার ফলে ঐ সামান্য কারখানাটি এখন একটি বিরাট্ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। উহার নাম 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাশিউটিক্যাল ওয়ার্কস্'। এখানে দেশীয় গাছ-গাছড়া হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। অন্যান্য বহু বিদেশীয় ঔষধ, গন্ধদ্রব্য এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এখানে নির্ম্মিত হইয়া দেশের বহু অভাব মিটাইতেছে। এই কারখানাটি বাঙ্গালীর একটি গর্ব্বের সামগ্রী। ইহা বর্ত্তমান ভারতের ঔষধ প্রস্তুতের একটি সর্ব্বপ্রধান কারখানা।

বাঙ্গালী জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেন। চাকুরী-প্রিয়তাই যে বাঙ্গালী জাতির

দৈন্য-দুঃখের প্রধান কারণ তাহা অনুভব করিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতিকে চাকুরীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমাদের কি দুর্ব্বলচিত্ত, চাকুরী-প্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে ? শক্ত হ'তে হবে, দৃঢ় হ'তে হবে, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ হ'তে হবে। অন্ন-সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। ব্যবসায় ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নাই।"

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাগারগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাগারগুলি পরিদর্শন করেন। যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সম্মেলন উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে তিনি তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। এই সময় তথাকার বহু বড় বড় সভা-সমিতি তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিয়া অভিনন্দিত করেন। ডারহাম্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সম্মানজনক ডি. এস্. সি. উপাধি প্রদান করেন।

তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক-পদ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। সেই কর্ম্মত্যাগ উপলক্ষে ছাত্রগণ যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন তাহাতে উক্ত হইয়াছিল,—

"আপনার অনাড়ম্বর জীবন আর তার ভারতীয় আদর্শ আমাদের সেই প্রাচীন ভারতীয় যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সব সময়েই আপনি আমাদের পথপ্রদর্শক নেতা এবং বন্ধু ছিলেন। আপনার মুক্তদ্বার, আপনার সদাপ্রফুল্লতা, আপনার ছাত্রদের প্রতি মুক্তহস্ততা, আপনার নীরব অথচ গভীর স্বদেশ-প্রেমের জন্য মনে হয়, আপনি যেন সেই পুরাতন যুগের ঋষি, গুরু—আমাদের জন্য নূতন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারত-সরকারকে বহু রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ১৯১৬ সালে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ প্রফুল্ল-চন্দ্রকে 'স্যার' উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। সেই হইতে তিনি **স্যার পি. সি. রায়** নামে পরিচিত!

১৯২১ সালে প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক উচ্চতম বিজ্ঞানালোচনার জন্য পুনরায় বিলাতে প্রেরিত হন। তিনি প্রায় ৫০ জন ছাত্র সহ বিলাতে যাত্রা করেন।

১৯২২ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি খুলনা জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে শত শত নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, শত শত অনশন-প্রপীড়িত কঙ্কালসার মৃত্যুপথ যাত্রীর হাহাকারে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দয়ার্দ্রহৃদয়

প্রফুল্লচন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া আর স্বীয় কর্ম্মশক্তিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে নিবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন নিরন্ন দেশবাসীর মুখে দুই মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার প্রিয় ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দুর্গতদিগের জন্য দরজায় দরজায় অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সমগ্র ভারতবাসীর নিকট তিনি দানের জন্য করুণ আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইল। তাঁহার চেষ্টায় দুর্ভিক্ষ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র সেই দিন হইতে নূতন ভাবে পরিচিত হইলেন।

খুলনার দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইতে না হইতেই সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বন্যায় উত্তর বঙ্গ ভাসিয়া গেল। রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলাই ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সংবাদ পাইয়াই প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ-সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়া বন্যাপীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। বহু যুবক তাঁহার আহ্বানে এই ত্রাণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। এবারও ভিক্ষা-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে বন্যা-বিধ্বস্ত স্থান সমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুর্গতদিগের দুঃখ মোচনে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রায় সাত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ যদিও কিছুই নয়, তথাপি আসন্ন বিপদে ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

চরকা প্রচারে প্রফুল্লচন্দ্র একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। চরকার উপকারিতায় তিনি এতদূর আস্থাবান্ যে, তিনি বলিয়াছিলেন,—কৃষিকার্য্যে কৃষক বৎসরে আট মাস কমান কাল বা তদপেক্ষা অল্প সময় ব্যয় করে, অবশিষ্ট সময় আলস্যে নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকেরা বৎসরে সর্ব্বসময়েই চরকায় সূতা কাটিতে কতকটা সময় ব্যয় করিতে পারেন এবং তাহাতেই সমগ্র পরিবারের বস্ত্রের অভাব দূর করা যায়। খুলনার দুর্ভিক্ষে এবং উত্তরবঙ্গ জল-প্লাবনে বিপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে চরকার প্রচলন করিয়া আমি বুঝিয়াছি, চরকা ব্যবহার করিলে এক বৎসরের অজন্মায় কৃষক সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থান-সমূহে চরকা চালনা করিয়া কৃষকেরা যে ফল পাইয়াছে, তাহাতে চরকাকে তাহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচনা করে।’

সমাজ সংস্কারক হিসাবেও প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, পণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন ইত্যাদি বহু সামাজিক ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সব বিষয়ে তিনি বহু বক্তৃতা দিয়াছেন এবং প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়াছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতেন তাই তিনি অধিকাংশ সভাসমিতিতেই মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন এবং তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক ও প্রবন্ধও বাংলা ভাষায় রচিত।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ বাঙ্গালীর জীবন।

সে জীবনে আড়ম্বর ছিল না, অহঙ্কার ছিল না, স্বার্থপরতা ছিল না। তিনি চিরকুমার-ব্রত গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহু জাতি, এমন কি, পৃথিবীর বহু জাতি, বাংলায় আসিয়া ব্যবসায় করিয়া দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে কিন্তু বাঙ্গালীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, বাঙ্গালা যুবকের দৃষ্টি চাকুরীর দিকে। এই গোলামীর মোহে পড়িয়া বাঙ্গলী সন্তানের আজ অন্নবস্ত্রের কষ্টের সীমা নাই। প্রফুল্লচন্দ্র ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিয়া বাঙ্গালীকে সেই পথে ফিরাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কঠিন সমস্যা-সকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে,—আমাদের কি দুর্ব্বলচিত্ত চাকুরীপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হ'তে হবে, দৃঢ়ব্রত হ'তে হবে, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ হ'তে হবে। অন্ন সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হ,য়ে যাবে। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়া আজ আমার অন্য কিছু বলবার নাই। এসব কাজে আমাদের স্পৃহা নাই—প্রবৃত্তি নাই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুলতে হবে, এই স্পৃহা মনে তীব্র হ'লে নূতন পথে চলতে সাহস হবে।"

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ত্যাগ ও দানের বিরাট্ প্রভায় সমুজ্জ্বল। তিনি সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার সামান্য অংশই তিনি নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয় করিয়াছেন। অবশিষ্ট সমস্তই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন দেশের নানা হিতকর্ম্মে।

৬ই জুন ত্যাগবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-তারিখ।

১৯৪৪ সালের সেই পবিত্র দিনেই বাংলার কৃতী-সন্তান আর্ত্তবন্ধু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার চিরপ্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজে মহাপ্রয়াণ করেন।

নিমতলা শ্মশানে তাঁহার বন্ধু বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথের চিতাপার্শে আচার্য্যদেবের দেহ সৎকার করা হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের গৌরবে সমগ্র বিশ্বের নিকট বাংলার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। বাঙ্গালী চিরদিন শ্রদ্ধা-সহকারে এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিবে। বাঙ্গালী সন্তান যদি এই ঋষিকল্প ত্যাগী দেশহিতৈষী মহামানবের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লয় তবে তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের অবসান হইবে এবং আচার্য্য-দেবের মুক্ত আত্মা দেবলোক হইতে তাহা দর্শন করিয়া পরম তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবেন।

—সমাপ্ত—